৩৯ বর্ষ ■ ২য় সংখ্যা ■ এপ্রিল-জুন ২০১৯

সূচিপত্র

আসুন কাণ্ডজ্ঞানে ফিরি	আশীষ লাহিড়ী	৩
কালো টাকা ও অর্থনীতি	শৈবাল কর	৫
স্বাভাবিক তাপমাত্রা	বিবেক সেন	৯
কুম্ভমেলায় মোক্ষ, মুনাফা	ভবানীপ্রসাদ সাহু	১১
শ্যামল গুহ প্রয়াত		১৩
আচমকা অজ্ঞান	গৌতম মিস্ত্রি	১৪
রাজা রামমোহন রায়	জয়ন্ত নারলিকার	১৯
দেশলাই বাক্সে সমাজ	উৎপল সান্যাল	২২
জিন সম্পাদিত শিশুকন্যা	সুশান্ত মজুমদার	২৪
বিজ্ঞানের ঐতিহ্য	ভবানীপ্রসাদ সাহু	২৭
চেনা বিষয় অচেনা জগৎ	সমীরকুমার ঘোষ	২৯
পুস্তক পরিচিতি		৩১
সংগঠন সংবাদ		৩২

সম্পাদক

সমীরকুমার ঘোষ

রেজিস্টার্ড অফিস: বি ডি ৪৯৪, সল্টলেক, কলকাতা-৬৪

কার্যালয়

খাদিমস বিদ্যাকুট আবাসন

বি ৪ ও ৫, এস-৩, নারায়ণপুর

পোঃ (আর গোপালপুর), কলকাতা- ৭০০১৩৬

ফোন: ৮৯০২৪১২২৯০/৯৮৩০৬৫৯০৫৮ /৮৭৭৭০৬৬৪৭২

ওয়েবসাইট: utsomanus@gmail.com

ই-মেল: utsamanush1980@gmail.com

ফেসবুক: http://www.facebook.com/utsomanus/

আশা আর নিরাশা

নানা খারাপ এবং নিরুৎসাহ-করা খবরের মাঝেই কিছু আশাব্যঞ্জক, ভালো ঘটনা বা খবরও থাকে। যার দৌলতেই আমরা ছুটে-চলার রসদ পাই। বইমেলায় অভূতপূর্ব সাড়া পাওয়া তারই অন্যতম। ইন্টারনেট ও মোবাইল ফোনের দাপট সত্ত্বেও বহু মানুষ এসেছেন বই কিনতে। হৈহৈ করে বিক্রি হয়েছে বই। অনেকে তো ট্রেন-বাস ঠেঙিয়ে অনেক দূর থেকেও হাজির হয়েছেন। বই প্রায় বস্তাবন্দী করে ফিরেছেন। এঁদের দেখে আমরা প্রবলভাবে প্রাণিত। আর্থিক এবং পরমার্থিক (পাঠক ও ক্রেতার সঙ্গে সরাসরি যোগাযোগ, মত-বিনিময় ইত্যাদি) লাভের কারণেই 'দূর এসব করে কী হবে' জাতীয় ভাবনা মন থেকে দূরে সরে যায়। গত দু বছর ধরে বইমেলা হচ্ছে সল্টলেকে। এখানে বইমেলায় সবচেয়ে বড় সুবিধা হল যাতায়াত। মেলাপ্রাঙ্গণের গায়েই বাসস্ট্যান্ড। মিলনমেলার মতো মাইল দুয়েক চড়াই-উতরাই ভেঙে মেলায় পৌঁছনো বা বেরনোর হ্যাপা নেই। সারি দিয়ে আসা বাসের ভেতর থেকে নিজের বাস খুঁজে পাওয়া এবং গুঁতিয়ে ওঠার দুর্ভাবনাও করতে হয় না।

নানা আর্থিক প্রতিকূলতা সত্ত্বেও এবারে মেলায় দু-দুটো বই হাজির করতে পেরেছি। 'বাঁধ বন্যা বিপর্যয়' মেলার মাসখানেক আগেই প্রকাশিত হয়েছিল। মেলা চলাকালীন এসেছে 'চেনা বিষয় অচেনা জগৎ'। এ ব্যাপারে জয়কালী প্রেস তথা তার কর্ণধার চিত্তরঞ্জন পানকে ধন্যবাদ দিতেই হয়। দুটো বই-ই পাঠক-আদৃত হয়েছে। হঠাৎ বেড়ে-যাওয়া পত্রিকার চাহিদার সঙ্গে অবশ্য আমরা তাল রাখতে পারি নি। অনেককে নিরাশ করতে হয়েছে।

লোকসভা ভোট আসছে। যে কোনো ভোটেই প্রতিশ্রুতির ফুলঝুরি বরাবরই কালীপুজো তথা দেওয়ালিকেও হার মানায়। স্বচ্ছগঙ্গা, দূষণমুক্তি ইত্যাদি পরিবেশ সংক্রান্ত শপথও নেওয়া হয়। বিপুল প্রচার হয়। কিন্তু আদপে সমস্ত নোংরা-আবর্জনা নিয়ে, কিছু লোকের হাহাকার শুনতে শুনতে নিঃশব্দে, নীরবে গঙ্গা বয়ে চলে। প্রতিশ্রুতি আর ফলবতী হয় না। হবেই বা কেন? গাছপালা, নদী তো আর ভোট দেবে না!

এ প্রসঙ্গেই সংবাদপত্রে প্রকাশিত এক প্রতিবেদনের কথা উল্লেখ করা উচিত। খবরের শিরোনাম ছিল 'বছরে ১০০

কোটি পাখি মৃত/ আমেরিকায় বহুতলের বলি অজস্র পরিযায়ী পাখি, বলছে সমীক্ষা'। আমাদের স্বপ্নের গন্তব্য আমেরিকা। আকাশছোঁয়া বহুতলের দেশ। আর তারই জেরে ফি বছর দক্ষিণ ও মধ্য আমেরিকা থেকে উত্তরের দিকে যাওয়া ও ফেরত আসা পরিযায়ী পাখিরদল প্রাণ হারাচ্ছে। আর সংখ্যাটা দু–চার শো বা হাজার নয় একেবারে বছরে ১০০ কোটি! নিউ ইয়র্ক শহরের পাখি সংরক্ষণ নিয়ে কাজ করা এক সংগঠনের অধিকর্তা সুজান এলবিন জানিয়েছেন, 'পাখিরা এই সব বহুতল ঘেরা শহরে ঢুকে দিগ্‌ভ্রান্ত হয়ে পড়ে অনেক সময়, গন্তব্য চিনতে না পেরে অন্যত্র চলে যায়। তারপর যখন দিনের আলো ফোটে, যখন খাবারের প্রয়োজন পড়ে, তখন তারা গাছের সন্ধানে উড়ে যায়। কিন্তু আসলে গাছ নয়, ওই কাচের বহুতলে গাছের যে প্রতিবিম্ব ছবি ধরা পড়ে সেগুলিকেই গাছ ভেবে ভুল করে সেগুলিতে গিয়ে আছড়ে পড়ে তারা। সেখানেই মৃত্যু হয় তাদের।' বিপজ্জনক মার্কিন শহরগুলোর মধ্যে সবার ওপরে রয়েছে ধর্মসভা আয়োজন করে বিখ্যাত শিকাগো। প্রতি হেমন্ত ও বসন্তে প্রায় ২৫০ প্রজাতির ৫০ লক্ষেরও বেশি পাখির যাতায়াতের পথে পড়ে কাচে–ঢাকা সুদৃশ্য বহুতলময় এই শহর। শিকাগো ছাড়াও আরেক বড় মরণফাঁদ ম্যানহাটন। রাতে চারদিক ঝলমল দেখলে আমরা ভারি খুশি হই। আমাদের সেই খুশিটুকু দেওয়ার জন্য কারণে–অকারণে রাস্তাঘাটে, উদ্যানে আলোর বান ডাকে। পৃথিবীতে মানুষের মৌরসিপাট্টা। সে আর কারও অস্তিত্ব নিয়ে ভাবতে রাজি নয়। মার্কিন মুলুকে যে সব পরিযায়ী পাখি দেশান্তরী হয়, তারা রাতেই উড়তে ভালবাসে। আকাশছোঁয়া বহুতলের চোখধাঁধানো আলোয় দিক ভুল করে তারা ঢুকে পড়ে শহরের ভেতর। কর্নেল ল্যাব অভ অর্নিথোলজির সমীক্ষা জানাচ্ছে, শিকাগো, ম্যানহাটন ছাড়াও হিউস্টন, ডালাসের মতো বড় বড় শহর পড়ে তাদের পথে। এছাড়াও লস এঞ্জেলেস, নিউ ইয়র্ক, সেন্ট লুই এবং আটলান্টাও আছে। নিউ ইয়র্কের পাখি সংরক্ষণ নিয়ে কাজ করা সংগঠনের স্বেচ্ছাসেবকেরা সেপ্টেম্বর ও এপ্রিলে শহরের রাস্তা থেকে বছরে ৯০ হাজার থেকে ২ লক্ষ পাখির মৃতদেহ পায়, যারা বহুতলের সঙ্গে সঙ্ঘর্ষে মৃত। স্মিথসোনিয়ান'স মাইগ্রেটরি বার্ড সেন্টারের হিসাব, গোটা দেশে এই সংখ্যাটা বছরে ১০ কোটি থেকে ১০০ কোটি! রবীন্দ্রনাথের 'সামান্য ক্ষতি' নামে একটি কবিতায় রাজমহিষী এক মাঘ মাসে শত সখী নিয়ে নদীতে স্নানে গিয়েছিলেন। স্নান সেরে শীত করায় প্রজাদের কুটীরে আগুন লাগিয়ে তপ্ত করেছিলেন 'করপদতল'। রানীর যুক্তি ছিল, 'গেছে গুটিকত জীর্ণ কুটির/ কতটুকু ক্ষতি হয়েছে প্রাণীর!/ কত ধন যায় রাজমহিষীর/ এক প্রহরের প্রমোদে।' যুক্তি অকাট্য। রানীকে রাস্তায় ভিক্ষা করে সেই বাড়িগুলো তৈরি করে দেওয়ার আদেশের মাধ্যমে কবি রাজাকে দিয়ে কাব্যিক রাজধর্ম পালন করেছিলেন। সে অন্য কথা। আমরা, যারা প্রবল উন্নয়নকামী, তারাও রানীর মতো বলে উঠতে পারি, একশো কোটির পাখি মারা যাচ্ছে বলে তো সভ্যতা বা উন্নয়ন থমকে থাকতে পারে না! আমাদের ঝাঁ–চকচকে পথঘাট, শিল্প, উন্নয়ন হবে বলে প্রয়োজনে হাজার, লাখ মানুষকেই উৎখাত করে ছুঁড়ে ফেলে দিতে পারি তো, সামান্য নগণ্য কিছু পাখি! কিছু পোকামাকড়, পাখির অসুবিধার কথা ভেবে এন্তার গাছকাটা থামিয়ে, রাতে বাগানে, রাস্তায় আলো নিভিয়ে, নিদেন কমিয়ে সৌন্দর্যায়ন প্রক্রিয়াকে ব্যাহত করার আবদার কোনো মতেই মানা যায় না! আশার কথা দিয়ে শুরু করেছিলাম, নিরাশার কথা দিয়ে শেষ করি। আমরা, যারা বিজ্ঞান ও যুক্তিবাদকে আশ্রয় করে বাঁচতে চাই, তারা সংখ্যালঘু। আমাদের তাই কাছাকাছি, পাশাপাশি থাকাটা তাই জরুরি। তার মধ্যেও কিছু প্রশ্ন ঘুরপাক খাচ্ছে, তা হল, আমরা কি পরবর্তী প্রজন্মকে কিছুটা হলেও যুক্তি বা বিজ্ঞানমুখী করতে পারছি? সম্ভবত নয়। তাই তো যিনি আজীবন যুক্তিবাদ ও বিজ্ঞান মানসিকতা নিয়ে কাটালেন, তাঁর প্রয়াণের পর উত্তরসূরিরা দেহদানের অঙ্গীকার অস্বীকার করেও দেহ দাহ করছেন, পারলৌকিক ক্রিয়াকর্ম নিষ্ঠার সঙ্গে পালন করছেন, লোকজনকে ডেকে সাড়ম্বর ভোজ খাওয়াচ্ছেন— এমনটা কেন হচ্ছে? মৃতের প্রতি সম্মান জানানোর এই শিক্ষাটা কি আমরা আমাদের উত্তর প্রজন্মের মধ্যে চারিত করতে পারছি না? উত্তরটা খোঁজা খুব জরুরি।

উমা

ওয়েবসাইট ও ফেসবুক পাঠকেরা খেয়াল করুন

পাঠকরা একটু খেয়াল রাখবেন, আমাদের ওয়েবসাইট ও ফেসবুক পেজ-এর নাম Utsomanush। তাই Utsamanush দিয়ে খুঁজবেন না। ওটি আমাদের পুরনো ঠিকানা, বর্তমানে বাতিল।

আমাদের ওয়েবসাইট: utsomanus@gmail.com

ফেসবুক: http://www.facebook.com/utsomanus/

আসুন, কাণ্ডজ্ঞানে ফিরি

এঁড়ে গরুই কাল হল?

আশীষ লাহিড়ী

এক

খাচ্ছিল তাঁতি তাঁত বুনে, কাল হল তার এঁড়ে গরু কিনে।। কাল না বলে এন্তেকালও বলা যায়। তার প্রচুর লক্ষণ চারদিকে ফুটে উঠছে।

লক্ষণ এক। সেদিন মেট্রোতে 'সিনিয়র' সিটের সামনে দাঁড়িয়ে আছি। সিটে–বসা একটি তরুণ অলস আধবোজা চোখে একবার আমার দিকে তাকিয়ে আবার আপন কর্মে রত হল। নিজে থেকে ছেড়ে না দিলে জায়গা চাইতে একটু বাধে। তাই কিছু না বলে দাঁড়িয়েই রইলাম। তরুণটি নিবিষ্ট হয়ে, কিন্তু ভাবলেশহীন মুখে হাতের যন্তরটিতে কী যেন দেখতে লাগল। একটু কৌতূহল হল। কী এমন দৃশ্য সে দেখছে যা তাকে বিশ্বসংসার ভুলিয়ে দিচ্ছে! একটু অসভ্যতা করে ঝুঁকে পড়ে তার হাতের যন্তরটির দিকে তাকলাম। দেখি, সে গোপাল ভাঁড়কে নিয়ে একটি কার্টুন–সিনেমা অত্যন্ত গম্ভীর মুখে দেখে চলেছে।

লক্ষণ দুই। মেট্রোতে বেশ ভিড়। ঠাসাঠাসি করে দাঁড়িয়ে আছি। পাশেই এক প্রৌঢ় সেই ভিড়ের মধ্যে কায়দা করে কীভাবে যেন একহাতে রড ধরে অন্যহাতে গুপিযন্ত্রটির দিকে একাগ্র হয়ে তাকিয়ে আছেন। রবীন্দ্রসদনে ভিড় একটু হালকা হল। বসার প্রশ্ন অবশ্য নেই। গাড়ির সামান্য ঝাঁকুনিতে ভদ্রলোক একটু অন্যমনস্কভাবেই আমার দিকে সরে এলেন। তখনো গভীর মনোনিবেশে ভুরুটুরু কুঁচকে গুপিযন্ত্র দেখে চলেছেন। ঠিক যেন ই=এম্ সি স্কোয়্যার ফরমুলা আবিষ্কারের আগের মুহূর্তের আইনস্টাইন। কৌতূহল সামলাতে না পেরে (এইটা আমার এক নতুন বদভ্যেস হয়েছে) আড়চোখে যন্ত্রটির দিকে তাকালাম। দেখলাম 'চিঁড়েতন হরতন ইস্কাপন অতি সনাতন ছন্দে করতেছে নর্তন।' তাসের দেশ, না শিবঠাকুরের আপন দেশ?

লক্ষণ তিন। রবীন্দ্রসরোবর স্টেশনে দাঁড়িয়ে আছি মেট্রোর জন্য। দুপুরবেলা। প্ল্যাটফর্ম ফাঁকা। এক সুবেশা রুচিশীলা যুবতী গুপিযন্ত্রে হেসে হেসে মৃদুমধুর ভাষে কথা বলছেন। একটু পরে গাড়ি এল। মহিলা গুপিযন্ত্রে কথা বলতে বলতেই কামরায় উঠলেন। ফাঁকা কামরা, কিন্তু বসলেন না। গেটের একপাশে দাঁড়িয়ে একই ওয়েভ লেংথে তরঙ্গ তুলে চললেন। গাড়ি পার্ক স্ট্রিট ছাড়িয়ে গেল। মধুসংলাপ প্রবহমান। চাঁদনিচকে একটু ভিড়। সামান্য গুঁতো। মহিলা নির্বিকার। সেন্ট্রাল ছাড়াল। অবস্থা অপরিবর্তিত। মহাত্মা গান্ধী রোড আসছে, এবার আমায় নামতে হবে। গেট খুলে গেল। প্রায় মুখে এসে গিয়েছিল, 'দিদি, আপনারা যখন বিয়ে করবেন, তখন দুজনের কারুরই কান কিন্তু কাজ করবে না! ব্যাপারটা খুব আন–রোম্যান্টিক হয়ে যাবে না?' কিন্তু মার খাবার ভয়ে ভালোমানুষের মতো নেমে গেলাম।

লক্ষণ চার। কানে গুপিযন্ত্র লাগিয়ে বাসে ওঠানামা করলে নাকি আড়াইশো (পাঁচশো?) টাকা জরিমানার ব্যবস্থা হয়েছে। সামনের ছেলেটি আর আমি একই সঙ্গে কলেজ স্ট্রিট স্টপে নামলাম। গাড়ি পুরোপুরি থামবার আগেই। ছেলেটির কানে তখনো হাতে–ধরা গুপিযন্ত্র। আমি তার কাঁধে টোকা দিয়ে বললাম, 'ভাই, আমি এক্ষুনি আপনার আড়াইশো টাকা বাঁচিয়ে দিলাম।' সে ফ্যালফ্যাল করে আমার দিয়ে চেয়ে রইল। আমি তাকে জরিমানার আইনের কথা বললাম। শুনে সে অবাক হয়ে নিজের পকেটে হাত দিয়ে টাকা গুনতে গুনতে আর গুপিযন্ত্রে কথা বলতে বলতে এগিয়ে গেল। এক সময় শুনতাম, এত ভঙ্গ বঙ্গদেশ, তবু রঙ্গে ভরা। আর বিশ্বাস করি না ও কথা। বাঙালিদের রসবোধ শেষ হয়ে গেছে। বাঙালিরা এখন রসিকতা বলতে জোক্স বোঝে। গুপিযন্ত্রে জোক্স–এর জোগান অবশ্য অফুরন্ত— কিছু শাকাহারী, বেশিরভাগই আমিষ।

লক্ষণ পাঁচ। ছেলেটির ফর্সা সুন্দর মুখে ঝাঁকড়া চুল আর দাড়িগোঁফ চমৎকার মানিয়েছে। বুদ্ধিদীপ্ত, সুগঠিত চেহারা। কামরায় উঠেই ব্যাগ থেকে গুপিযন্ত্র বার করে কানে গুঁজল

ইয়ার ফোন। তারপরই কয়েক সেকেন্ডের মধ্যে বদলে গেল হাবভাব। নেহাত চলন্ত মেট্রো বলে সে নাচতে পারছে না। কিন্তু চোখেমুখে, কোমরে যেভাবে 'ভাও বাতলাচ্ছে', দেখে আমি চমৎকৃত। ভাবলাম, একটু-আধটু গানবাজনার শখ তো আমারও আছে। কিন্তু মেট্রোয় গুবগুবি বাজিয়ে নৃত্য করার কথা তো কখনো ভাবিনি! নিজের ঘরে হাত-পা না ছড়াতে পারলে গান আমার কানে রুচবেই না। তা এর বাপ-মায়ের অবস্থা কি এতটাই খারাপ যে বাড়িতে বসে বেচারার গান শোনার (কিংবা নাচবার) ফুরসতটুকু মেলে না? তাই এই ফ্রি মেট্রো সার্ভিসের সুযোগ গ্রহণ!

দুই

স্মার্ট-গোলামি মুর্দাবাদ!

ঢের হয়েছে রহস্য। এবার একটু বিজ্ঞানে ফেরা যাক।

গত ৬ মার্চ ইংরেজি স্ট্রেট্‌সম্যানে অভীক রায়ের একটি অনবদ্য লেখা বেরিয়েছে ('অ্যাডিক্‌শন অ্যান্ড গেজ')। অভীকবাবু লস এঞ্জেলেসের লয়োলা মেরিমাউন্ট বিশ্ববিদ্যালয়ের কমিউনিকেশন স্টাডিজ-এর অধ্যাপক। উৎস মানুষে পুরো লেখাটাই অনুবাদ করে দিতে পারলে মন্দ হত না। কিন্তু আপাতত তার বদলে রায় মহাশয়ের মূল বক্তব্যগুলোর একটা সারসংক্ষেপ দিয়েই ক্ষান্ত থাকছি।

১) ভারত জগৎসভায় শ্রেষ্ঠ: ২০১৭ সালে ভারত মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রকে একটা ব্যাপারে টেক্কা দিয়েছে। আমরা ১২.১ বিলিয়ন (১২.১ x ১০০ কোটি) মোবাইল অ্যাপ ডাউনলোড করেছি; ওরা করেছে মাত্র ১১.৩ বিলিয়ন। কম কথা! ২০১৮ সালের হিসেবে অনুযায়ী ভারতীয়রা গড়ে প্রতিদিন ঘণ্টাতিনেক সময় কাটায় তাদের স্মার্ট ফোন নিয়ে। তার মানে, আনস্মার্ট ভারতীয়দের কথা বাদ দিলে বহু ভারতীয় আসলে দিনে অন্তত ছ-সাত ঘণ্টা সময় কাটায় তাদের এই প্রিয় যন্ত্রটিকে নিয়ে।

২) **নেই-মোবাতঙ্ক:** গবেষকেরা একটা নতুন অসুখ আবিষ্কার করেছেন, তার নাম দেওয়া হয়েছে nomophobia (no-mobile-phobia)। বাংলায় নেই-মোবাতঙ্ক বলা চলে। এ রোগের লক্ষণ হল মোবাইল ফোন না-থাকলে কী হবে, এই ভাবতে ভাবতে উদ্বেগ-আশঙ্কার মনোরোগী হয়ে পড়া। জলাতঙ্ক কিংবা বোমাতঙ্কের চেয়ে কিছু কম মারাত্মক নয় এই নেই-মোবাতঙ্ক।

৩) **মাথার পক্ষাঘাত:** রায় মহাশয় কেভিন রোজ নামক এক স্মার্ট-নেশাড়ুর করুণ আত্মকাহিনীর বিবরণ দিয়েছেন। কেভিন লিখেছেন, স্মার্ট-নেশার মাসুল দিতে গিয়ে তিনি বই পড়তে পারতেন না; পূর্ণদৈর্ঘ্যের সিনেমা পুরোটা ধৈর্য ধরে দেখতে পারতেন না; কারো সঙ্গে অনেকক্ষণ ধরে কোনো বিষয় নিয়ে আলাপ-আলোচনা চালাতে পারতেন না।

এই লক্ষণগুলো আজকের পৃথিবীতে মহামারীর আকার ধারণ করেছে। মাসাচুসেট্‌স ইনস্টিটিউট অভ টেকনোলজির নিউরোসায়েন্সের অধ্যাপক আর্ল মিলার বলছেন, আমরা যখন মন দিয়ে কোনো কাজ করার পাশাপাশি ফোনও ব্যবহার করি, তখনই মন তার নির্দিষ্ট কাজের বিষয়টি থেকে সরে যায়। ফলে যে-প্রকল্প নিয়ে আমরা কাজ করছি তা নিয়ে গভীরভাবে ভাবার ক্ষমতা চলে যায়। আমরা ভাবি, তাতে কী হয়েছে, ফোনে খানিকক্ষণ কথা বলেই তো আবার ফিরে আসব কাজে; তা কিন্তু হয় না। গভীর মনোযোগের যে মাত্রায় আমরা কাজ করছিলাম, ফোন-পর্বের শেষে সেই মাত্রা ফিরিয়ে আনা বেশ কঠিন। কারণ একটা থেকে অন্য বিষয়ে চলে গিয়ে আবার সেই বিষয়ে ফিরে আসতে গেলে মস্তিষ্ক একটা মূল্য আদায় করে নেয়। সেটা নেহাত কম নয়। স্মার্ট-প্রযুক্তির ওপর অতি-নির্ভরতা আসলে মানুষের কর্মপটুতা কমিয়ে দিচ্ছে।

৩) ভূতুড়ে বার্তাতঙ্ক: ওই বুঝি কোনো মেসেজ এল, এই ভেবে সব সময় উৎকর্ণ হয়ে থাকতে থাকতে একটা সময় আসে যখন কোনো বার্তা না এলেও আমরা ভাবি বার্তা এসেছে। এর নাম দেওয়া হয়েছে 'ফ্যান্টম টেক্সট সিন্‌ড্রোম', বাংলায় ভূতুড়ে বার্তাতঙ্ক। স্মার্ট নেশাড়ুরা অনেকেই এই রোগে ভোগেন। এর ফলে মূল কাজের তো ক্ষতি হয়ই, উপরন্তু সত্যিকারের মেসেজ আসেনি দেখে মন আরো বিষণ্ণ হয়ে পড়ে।

৪) প্রযুক্তি-গ্রীব লক্ষণ: না, ইনি সুগ্রীবের ভাই নন। এঁর ইংরেজি নাম tech neck। ৬০ ডিগ্রি কোণে মাথা ঝুঁকিয়ে ফোনের পর্দার দিকে অবিরাম চেয়ে থাকার ফল হচ্ছে গলার উপর ৬০ পাউন্ড (২৭ কেজি) চাপ পড়া। এর ফলে নানারকম শারীরিক উপসর্গ দেখা দিচ্ছে।

৫) বিবিধ: এছাড়া দেখা কিংবা শোনার অসুবিধা, অনিদ্রা, এসব তো স্মার্ট নেশাড়ুদের নিত্যসঙ্গী। সবচেয়ে বড়ো সমস্যা হচ্ছে, বাইরের বাস্তব জগতের সঙ্গে সম্পর্কহীনতা। অনেককে জড়িয়ে নিয়ে, সত্যিকারের মানবিক সম্পর্ক পাতিয়ে, সত্যিকারের ইয়ার্কি-ফাজলামি-রসিকতায় মাখা, সত্যিকারের প্রেম-ভালোবাসা-বন্ধুত্ব তৈরি করার বদলে একটা 'ভার্চুয়াল' সম্পর্কের মায়াজগতে প্রবেশ করছে স্মার্ট-নেশাড়ুরা। আত্মকেন্দ্রিকতার চরম গহ্বরে ঢুকে যেতে যেতে

অবশেষে নিজের থেকেও বিচ্ছিন্ন হয়ে পড়ছে মানুষ। লুইস ক্যারলের সেই বেড়ালের মতো তার হাসিটা থাকছে, সে নিজে উবে যাচ্ছে।

তিন

উপায়?

তা হলে কি স্মার্ট ফোন ছেড়ে দেবেন? না, আদপেই না। কারণ এর উপযোগিতার দিকটা তো অসামান্য। তাই কতকগুলো টোটকা দিচ্ছেন বিশেষজ্ঞেরা, যাতে স্মার্ট হয়েও সুস্থ এবং মানবিক থাকা যায়।

মাঝে মাঝে স্মার্ট ফোন থেকে অবসর নিন।

চলে যান আন-স্মার্ট প্রকৃতির কোলে। সেই শুশ্রূষায় আপনার উদ্বেগ-আতঙ্কগুলোর ওপর শান্তির প্রলেপ পড়বে।

সপ্তাহান্তে 'ডিজিটাল ছুটি' নিন, অন্তত ২৪ ঘণ্টা স্মার্ট ফোন বন্ধ রাখুন।

ফোনে এমন ব্যবস্থা রাখুন যাতে আধ ঘণ্টায় একটার বেশি মেসেজ বা মেল না আসতে পারে।

সবচেয়ে বড়ো কথা, বাস্তব জীবনের সুখ-আনন্দ-দুঃখের সঙ্গে, সংস্কৃতির সঙ্গে নিজেকে জড়িয়ে রাখুন। বাস্তব জীবনকে উপভোগ করুন। অন্তত এটুকু করলে আপনার ভাবনাচিন্তার ক্ষমতাটা লোপ পাবে না, আপনি নিজেকে মানুষ বলে অনুভব করবেন।

শেষ কথা: নিরন্তর স্লোগান দিন; স্মার্ট-গোলামি মুর্দাবাদ! মানুষ আমরা, নহি তো মেষ। খেয়াল রাখুন, আপনার সুবিধার জন্য স্মার্ট ফোনের উদ্ভব; স্মার্ট ফোনের সুবিধার জন্য আপনি উদ্ভূত হননি। সোজা বাংলায়, কাণ্ডজ্ঞানে ফিরুন। **উমা**

কালো টাকা ও ভারতের অর্থনীতি

শৈবাল কর

পৃথিবীর বহু দেশেই জাতীয় আয়ের একটি অংশ খাতায়-কলমে হিসেবের বাইরে থেকে যায়। এর অনেক নাম। কখনো-সখনো এই গোপন আয়ের হিসেব প্রকাশিত হয় নির্দিষ্ট কিছু তথ্যের উপর ভিত্তি করে। কখনো খরচ করার প্রবণতা বা পরিমাণের সঙ্গে রোজকারের অমিল থেকে আর্থিক প্রতিষ্ঠানগুলি, রাজ্য এবং কেন্দ্রীয় সরকার বোঝার চেষ্টা করে কতটা রোজগার হিসেব-বহির্ভূত। যে দেশে অসংগঠিত ক্ষেত্রের বিপুল বিস্তার, সেখানে মোট আয়ের অনেকটা অংশ হিসেবের খাতায় ওঠেই না। এর একটা কারণ হল, এখনও বহু আদান-প্রদান হয়ে থাকে ক্যাশে বা নগদে এবং তা কোথাও নথিভুক্ত হয় না। মনে করুন, আপনি ফুটপাথে-বসা একজন বিক্রেতার কাছ থেকে ৫০০ টাকা দিয়ে একটি কাপ-ডিশের সেট কিনলেন। নগদে টাকা দিলেন এবং সাদা কাগজে একটি হাতেলেখা রসিদ সম্বল করে জিনিস নিয়ে বাড়ি চলে গেলেন। বাকিটা বিশ্বাসের ওপর চলে। জিনিস খারাপ বা অপছন্দ হলে তা ফেরতও দেওয়া যায় স্রেফ পারস্পরিক বিশ্বাসের ওপর নির্ভর করে। কোনো তরফে বিশ্বাসভঙ্গ হলে আইনি উপায়ে কিন্তু কিছু করার থাকে না, কারণ এই ব্যবসা কোনোখানে নথিবদ্ধ হয়নি। একই কারণে এই ব্যবসায়ীর রোজগারের ওপর সরকার কোনোভাবেই খবরদারি করতে পারে না, কারণ কত টাকার ব্যবসা হয়েছে তার প্রামাণ্য (নিদেনপক্ষে আদালতে যা প্রমাণস্বরূপ পেশ করা যায়) কোনো তথ্য পাওয়াই যায় না। এই ব্যবসায়ীর মুনাফা, তা ৫০ টাকা হলেও, কিন্তু হিসেব-বহির্ভূত রোজগার এবং কালো টাকার বিপুল সমুদ্রে আরও এক ঘটি জল ঢালার মতো। এই গোপন অর্থনীতি, কালো অর্থনীতি (ছায়াও তো কালোই দেখায়), যে নামেই ডাকুন না কেন, জাতীয় রোজগারকে খণ্ডিত করে এবং করদাতা ও করদাতা নয় এমন ব্যক্তি ও প্রতিষ্ঠানের মধ্যে বিভাজন সৃষ্টি করে।

ভালো অর্থনীতির বিচারে কালো টাকার পরিমাণ হওয়া উচিত শূন্য, অর্থাৎ সমস্ত রোজগারই যেন হিসেবের আওতায় থাকে। তবে, বহু ক্ষেত্রেই যা আদর্শ অবস্থা তা নিশ্চিত করা আদৌ সম্ভব হয় না। যেমন, একটি দেশকে সম্পূর্ণ দারিদ্র্যমুক্ত

করা যায় না, পৃথিবী থেকে যুদ্ধের আশঙ্কা ১০০% মুছে ফেলা যায় না ইত্যাদি। এর কারণ, ভালোর সঙ্গে খারাপের এই নিরন্তর যুদ্ধের মধ্যে আসলে বহু ব্যবসায়িক দিক রয়েছে, যা আমাদের রাজনৈতিক ও সামাজিক জীবনের অবিচ্ছেদ্য অঙ্গ। যাই হোক, উন্নত দেশগুলিতে এর প্রকোপ নিঃসন্দেহে অনেক কম। এর প্রধান কারণ হল, উন্নত দেশে অসংগঠিত ক্ষেত্রে পরিধি বিস্তৃত নয় এবং যে কালো টাকা এই দেশগুলির অর্থনীতিতে ঘোরাফেরা করে, তা উঁচুতলার দুর্নীতিজনিত এবং বাকিটা অপরাধ সংক্রান্ত, যেমন মাদক-ব্যবসা বা চোরাচালান থেকে উদ্ভূত হওয়া। শোনা যায়, আমেরিকাতেও করফাঁকি দেওয়ার প্রবণতা বেশ বেশি এবং কর্পোরেট সংস্থা আর ব্যবসায়ীগোষ্ঠীর ফাঁকি দেওয়া টাকা নাকি কেইম্যান দ্বীপপুঞ্জের ব্যাঙ্কে গচ্ছিত থাকে! তবে, এগুলো নাকি মাফিয়ার টাকা। রাজনৈতিক নেতাদের লক্ষ-কোটি ডলারও এসব জায়গায় রাখা আছে, এমনটি সচরাচর শোনা যায় না। তবে আমেরিকা থেকে পূর্বের দিকে বা দক্ষিণের দিকে চলতে শুরু করলে, এমন অভিযোগ যথেষ্টই শোনা যায়। রাশিয়া এবং পূর্ব ইউরোপের স্বৈরতান্ত্রিক দেশগুলিতে, তেল, কয়লা ইত্যাদি প্রাকৃতিক সম্পদ-বাবদ প্রচুর কাঁচা টাকার লেনদেন হয়ে থাকে। ইতালিতেও দুর্নীতিপরায়ণ রাজনৈতিক নেতারা নাকি বিস্তর ডলার-পাউন্ড-ইউরো সুইৎজারল্যান্ডের ব্যাঙ্কে গচ্ছিত রাখেন। মধ্যপ্রাচ্য এবং আফ্রিকার নেতাদের কথা না তোলাই ভালো, কারণ একটি যুক্তি হল, যে দেশগুলিতে রাজনৈতিক অস্থিরতা যত বেশি, তত বেশি হারে টাকা অন্যত্র সরিয়ে ফেলে ভবিষ্যতের ব্যবস্থা এরা করে রাখে। ফলে আফ্রিকাতে অর্জিত অর্থের অধিকাংশ থাকে আফ্রিকার বাইরে, অন্তত যে দেশে স্বৈরতন্ত্রের প্রভাব যত বেশি, সেখানে তো বটেই।

দক্ষিণ আমেরিকার কয়েকটি দেশেও একনায়কদের দৌরাত্ম্যে এই ঘটনাগুলি ক্রমান্বয়ে ঘটে চলেছিল, যা সম্ভবতঃ ইদানীং একটু কমতির দিকে। অবশ্য একই সঙ্গে দক্ষিণ আমেরিকার দেশগুলিতে আর্থিক বৈষম্যও নাকি কমেছে। কয়েকটি তথ্য বলছে, এই বৈষম্য কমার পেছনে রয়েছে ছায়া অর্থনীতির বাড়বাড়ন্ত, যা কিনা আবার কালো টাকার প্রভাব বাড়াতে সাহায্য করে। তবে, সেই কালো টাকা কেন্দ্রীভূত না হয়ে ছড়িয়ে-ছিটিয়ে থাকলে অবশ্য তা আর লক্ষ-কোটি ডলারে পরিবর্তিত হয়ে সুইস ব্যাঙ্কে জমা পড়বে না।

এদের তুলনায় এশীয় দেশগুলিও পিছিয়ে নেই। থাইল্যান্ডের মোট জাতীয় আয়ের ৫০%-রও বেশি আসে অসংগঠিত ক্ষেত্র থেকে, যাতে কর আরোপ করা যায় না, এবং রোজগারের সঠিক পরিমাপও করার উপায় থাকে না। পাকিস্তান, বাংলাদেশ, ইন্দোনেশিয়া, মালয়েশিয়াতেও এর শতাংশ কম নয়। ভারতে মোটামুটি ২৫% রোজগার আসে ছায়া অর্থনীতি থেকে আর কর্পোরেট সংস্থা থেকে যে টাকা ঘুষ হিসেবে পেয়ে থাকে এ দেশের রাজনৈতিক নেতারা তা অজ্ঞাতেই থেকে যায়। কারণ এতদিন যাবৎ কোনো রাজনৈতিক দল বা নেতাই এই গোলমেলে বিষয়টি নিয়ে মুখ খুলতে চান নি। আমাদের প্রথম প্রধানমন্ত্রী বলতেন যে সমস্ত কালোবাজারি এবং ভেজাল জিনিসের বিক্রেতাকে ল্যাম্পপোস্টে ঝোলাবেন। কতজন ঝুলেছে, তার হিসেব আমার মতন অর্বাচীন দিতে পারবে না, তবে এই ঘোষণার পরে যে কালোবাজারি উধাও হয়নি, তার প্রমাণ যথেষ্ট রয়েছে। সুতরাং ফাঁকা বুলিতে যদি পৃথিবী বদলে ফেলা যেত, তা হলে এতদিনে আমরা সেই আদর্শ পৃথিবীতে বাস করতাম, আর প্রধানমন্ত্রীর নিজের বাড়িতেই ওঠা ঘুষের টাকা সুইস ব্যাঙ্কে রাখার অভিযোগ ধোপে টিকবে কিনা, তা নিয়ে বিস্তর সন্দেহ থেকে যায়। কোনো ঘটনা ঘটার প্রায় তিরিশ বছর পরে কাগজের সূত্র ধরে অপরাধী খুঁজে বের করতে একাধিক শার্লক হোমসের প্রয়োজন পড়বে। আর সত্যি জানতে পারলেও মুখ খুলবেন কিনা সেটা হোমসকে জেনে নিতে হবে সরকারি মহল থেকে। দেশ থেকে টাকা সরিয়ে বিদেশে পাচার করার সঙ্গে কে যে যুক্ত আছে, আর কে যে নেই, তা খুব সহজবোধ্য নয় বলেই মনে হয়।

রবার্ট মুগাবে নাকি কিছুদিন আগে কোথায় বলেছেন, কালোরা বরাবরই সাদাদের তুলনায় পিছিয়ে থাকবে। তাঁর মতে, এর কতগুলো বিশ্বজনীন কারণ রয়েছে। সাদা গাড়ির চাকা কালো রঙের হবেই, মানুষ সাদা জামা কেচে তবেই কালো বা রঙিন জামা কাচবে; কালো রং দিয়েই খুলিচিহ্ন এঁকে বিপদ বোঝানো হবে; ইত্যাদি। পরিশেষে মুগাবে বলেছেন যে, তিনি অবশ্য দুঃখিত নন, কারণ কালো মানুষের বাথরুমেও সাদা টয়লেট পেপার থাকে। যেটা বলতে ভুলে গিয়েছেন, তা হল, আর যা কিছু নিয়েই আক্ষেপ থাকুক না কেন, 'কালো টাকার' জোর যে সাদা টাকার চেয়ে কম নয়, সেটাও তো মানতে হবে। মুগাবেদের দুর্নীতির ইতিহাস যা শোনা যায়, তাতে সন্দেহ হয় যে, এদের বাথরুমে আসলে সাদা টয়লেট পেপারের পরিবর্তে কালো টাকার বান্ডিল ব্যবহার করা হয়। ভারতেও কি আর তা হয় না! আর এই বাবদ রাজনৈতিক, সামাজিক ক্ষমতায়নের কথাটাও ভেবে

দেখুন। ঘুষ নিয়েছে কি নেয়নি; সুইস ব্যাঙ্কে সেই টাকা গচ্ছিত রেখেছে কি রাখেনি, তা 'জানতেই' ৩০ বছর পার করে দিতে পারে একের পর এক ক্ষমতায় আসা সরকার। সত্যিটা জানার পর সর্বসমক্ষে এদের নাম বলা যাবে কিনা তা নিয়ে সুপ্রিম কোর্টের সঙ্গে টালবাহানা করতে আরও দশ-বিশ বছর কাটিয়ে দেওয়া খুব শক্ত হবে না। ২৫ লক্ষ-কোটির কালো টাকা উদ্ধারে নেমে বর্তমান সরকার যে তিনটি নাম বলতে পেরেছে, এতেই ভারতবাসী ধন্য ধন্য রব তুলে এদের আরও দশ বছর ক্ষমতায় রেখে দেওয়া উচিত বলে মনে করছেন। বছরে গড়ে পাঁচটি করে নাম বেরোলে, দশ বছরে পঞ্চাশটি নাম ! গত পঞ্চাশ বছরে তো একটিও নাম বেরোয়নি!

এ বিষয়ে আমরা কয়েকটি উন্নত দেশের সমগোত্রীয়। উত্তর আমেরিকার ঘুষের টাকা, ড্রাগ, চোরাচালান, নারীপাচার ব্যবসার টাকা জমা থাকে কেইম্যান দ্বীপে, সেন্ট কিটসে। রাশিয়া, ইতালি, ফ্রান্স, পূর্ব ইউরোপের কালো টাকা যায় মধ্যপ্রাচ্যে ও ক্যারিবীয় দ্বীপপুঞ্জে। ভারতের কালো টাকার যে অংশ সুইস ব্যাঙ্কে থাকে না, তা যায় মরিশাসে। তারপর, সেই টাকাই প্রত্যক্ষ বিদেশি বিনিয়োগ হয়ে এ দেশেই ফিরে আসে। মরিশাসের সঙ্গে ভারতের নিঃশুল্ক আর্থিক আদান-প্রদানের একটি চুক্তি আছে, যার দরুণ পুরো ব্যাপারটিই করক্ষেত্রের আওতার বাইরে।

বস্তুত, কর না দেওয়া টাকাই কালো টাকা— তা সে পঞ্চাশই হোক বা পাঁচ কোটি ! ব্যবসায়িক আদান-প্রদান নথিবদ্ধ না করার বিষয়টিতে উন্নয়নশীল দেশগুলো এমনিতেই চ্যাম্পিয়ন। সবেতেই কাঁচা রসিদ, সবার দু-তিনটে করে হিসেবের খাতা— সত্যি, অর্ধসত্যি এবং পুরো মিথ্যে। এই ছায়া অর্থনীতির বহর কায়েম রাখতে সরকার এবং তার অধীন কর্মীদের প্রত্যক্ষ মদত রয়েছে। মাছের তেলে মাছভাজা! আমাকে কালো টাকা রোজগার করতে দিলে তবেই তো আমি পার্টি ফান্ডে, নেতাদের, আইনরক্ষকদের পকেটে কমিশন বাবদ, ঘুষ বাবদ পাওয়া কালো টাকার জোগান দেব। দুর্নীতির ভিতের ওপর গড়ে ওঠে দুর্নীতির রাজপ্রাসাদ। কেকের ওপর চেরির মতন। এর সঙ্গে রয়েছে বিদেশি মুদ্রায় রোজগার বিদেশে রেখে দেওয়া যেতে পারে। মুগাবে কি পিনোশেরা বলে থাকেন, যে দেশে এত রাজনৈতিক অস্থিরতা, কাল কি হবে তার ঠিক নেই, রিটায়ার করে তো কিছু খেতে হবে! টাকা বরং রাজনৈতিকভাবে সুস্থির কোনো দেশে থাকুক। এর বেশিরভাগটাই দেশ থেকে চালান করা টাকা, ফলে বিদেশে আয়কর প্রদান করার দায়টুকুও নেই। অন্যদিকে দেশের কর ব্যবস্থারও আয়ত্তের বাইরে।

রপ্তানিকারকদের টাকা অবশ্য প্রথাগতভাবেই কিছুটা রেখে দেওয়া থাকে বিদেশের ব্যাঙ্ক আকাউন্টে, কারণ অনেক রপ্তানিকারককে উৎপাদনের জন্য প্রয়োজনীয় কাঁচামাল আমদানি করতে হয়। গত বছর যখন টাকার দাম ডলারের তুলনায় নিম্নমুখী, তখনও এই প্রসঙ্গটি আলোচিত হয়। টাকার দাম পড়ে গেলে, ডলার ভাঙিয়ে যেমন আয় বেশি হয়, তেমনি ডলার কিনতে গেলে আগের তুলনায় বেশি টাকা

সবেতেই কাঁচা রসিদ, সবার দু-তিনটে করে হিসেবের খাতা— সত্যি, অর্ধসত্যি এবং পুরো মিথ্যে। এই ছায়া অর্থনীতির বহর কায়েম রাখতে সরকার এবং তার অধীন কর্মীদের প্রত্যক্ষ মদত রয়েছে। মাছের তেলে মাছভাজা! আমাকে কালো টাকা রোজগার করতে দিলে তবেই তো আমি পার্টি ফান্ডে, নেতাদের, আইনরক্ষকদের পকেটে কমিশন বাবদ, ঘুষ বাবদ পাওয়া কালো টাকার জোগান দেব। দুর্নীতির ভিতের ওপর গড়ে ওঠে দুর্নীতির রাজপ্রাসাদ। কেকের ওপর চেরির মতন।

ঢালতে হয়। এতবার টাকা ভাঙাভাঙি না করে বিদেশি মুদ্রায় সরাসরি ব্যবসা করলে সাশ্রয় হয়। আর এসব কোটি-কোটি টাকার ব্যাপার, ফলে হিসেবের খাতায় কলকাঠি নেড়ে রাখা হয়, যাতে রপ্তানির রোজগার খানিকটা কম করে দেখানো যায়। এই যে রপ্তানির রোজগার দেশে ফিরল না এবং কর যথোচিত রোজগার হল না সরকারের, এটা কালো টাকার উৎস। বিদেশি মুদ্রায় রোজগার হল এবং বিদেশের ব্যাঙ্কে রয়ে গেল দেশের কর ফাঁকি দিয়ে। সরকারের ৭০০ জনের তালিকায় এরকম ব্যবসায়ীদের নাম আছে? নাকি, এদের

ধরলে যদি এরা রাগ করে রপ্তানি বন্ধ করে দেয়, সেই ভয়ে সরকার কর প্রদানের দায়টা মধ্যবিত্তের ঘাড়ে চাপিয়ে দিচ্ছে? এই ব্যবসায়ীদের কাছে ব্যবসাটা কিসের, তা বিশেষ প্রাধান্য পায় না। মুনাফা হল কিনা সেটাই শেষ কথা।

দার্জিলিং-ডুয়ার্সের অনেক চা-বাগানের ম্যানেজার বলেন যে, মালিক জোর করে ক্ষতি দেখাচ্ছেন খাতায়-কলমে। কারণ, এরা মকাইবাড়ির রাজাবাবুর মতো প্রথাগত চা-বাগানের মালিক নন। কালকেই চা-ব্যবসা গুটিয়ে নিয়ে দেবদেবীর ফিল্ম করতে টাকা ঢালবেন। আর সেখানে একবার ঢুকে গেলে ব্যাপার জটিলতর। কার টাকা কোথায় কীভাবে খাটছে, বুঝতে না পেরে হয়ত দেখা যাবে যে সরকারই উল্টে প্রযোজককে ট্যাক্স দিতে চাইছে ! সুতরাং, সদাচঞ্চল বিনিয়োগকারী আর বিদেশি মুদ্রা উপার্জনকারীকে না ঘাঁটানোই ভালো।

৭০ বছর ধরে নির্বিবাদে ভোট, ইনকাম ট্যাক্স, ভ্যাট ইত্যাদি দিয়ে আসা মধ্যবিত্ত রয়েছে কি করতে! সরকার খাওয়াচ্ছে-পরাচ্ছে, চীন-পাকিস্তানের হাত থেকে রক্ষা করছে, আর একটু ট্যাক্স দিতে আপত্তি!

কালো টাকা দেশে ফিরিয়ে আনা আমেরিকা থেকে পালিয়ে আসা এডওয়ার্ড স্নোডেনকে (যিনি আমেরিকার গোপন তথ্য ফাঁস করে এখন রাশিয়ায় আত্মগোপন করে আছেন) ফেরত নিয়ে যাওয়ার থেকেও অনেক শক্ত। কালো টাকায় হাত পড়লেই বিস্তর কোর্টকাছারি, মামলা-মোকদ্দমা শুরু হয়ে যাবে। কোর্টের বাইরে সমাধানসূত্র খুঁজে বের করতে না পারলে, সরকার আসবে-যাবে কিন্তু সুইস ব্যাঙ্কে মাছিটিও গলবে না।

সামগ্রিকভাবে অবশ্য আরও একটি বিপদের আশঙ্কা রয়েছে। সুইস ব্যাঙ্কেই থাকুক আর সেন্ট কিটসে, এই ২৫ লক্ষ কোটি টাকা কিন্তু বিদেশের বাজারে খাটছে, যদি না তা ঘুরপথে এতদিনে ভারতে পৌঁছে গিয়ে থাকে। এত টাকা বেরিয়ে গেলে বিদেশের মূলধনের ভাণ্ডারে ঘাটতি হবে এবং সে দেশে সুদের হার বাড়বে। সুদের হার যথেষ্ট বাড়লে, এই সব দেশগুলো থেকে যে প্রত্যক্ষ বিদেশি বিনিয়োগ ভারতে উঁচু সুদের সুবিধে নিতে আসে, তাতে টান পড়তে পারে।

অন্যদিকে, ভারতে হঠাৎ করে এত টাকা ঢুকে পড়লে এখানেও সুদের হার কমে যেতে পারে। টাকা ব্যাঙ্কে থাকলেই তো আর রোজগার হয় না, সেটা জায়গামতন বিনিয়োগ করতে না পারলে ব্যাঙ্কেরও লাভ নেই, আমানতকারীরও নেই। অনেক টাকা ধার দেওয়ার মতন আছে কিন্তু নেওয়ার লোক নেই, এমনটা হলে সুদের হার কমবে বৈকি। ফলে কেন্দ্রীয় অর্থমন্ত্রীকে তখন আর রিজার্ভ ব্যাঙ্কের সঙ্গে সুদ কামানো নিয়ে মারপিট করতে হবে না।

আসলে এই বিষয়ে সম্ভবত সবচেয়ে বড় প্রশ্ন হল, কালো টাকা হাতে পেলে সরকার কী করবে? যদি কালো টাকা দেশের উৎপাদনে বিনিয়োগ করে সরকার, তাহলে প্রত্যক্ষ বিদেশি বিনিয়োগের ঘাটতি হলেও অসুবিধে নেই। যদি উন্নয়নমূলক কাজে ব্যবহার করে, তাহলে ক্রমশ কমতে থাকা বিদেশি অনুদানের ওপর নির্ভরশীলতা আরো কমবে। কেন্দ্র নিজে সরাসরি খরচ না করে রাজ্যগুলোর হাতে প্রাপ্য টাকার পরিমাণও বাড়িয়ে দিতে পারে। সুতরাং, কালো টাকা ফেরতের আশায় বাংলায় বসে আমাদের কিছু প্রার্থনা করতে বাধা কোথায়? এই পরিমাণ টাকা দেশে ফেরত এলে এবং কেন্দ্রীয় সরকার অর্থ কমিশনের নিয়ম মেনে তা রাজ্যগুলোয় বিতরণ করে দিলে পশ্চিমবঙ্গ কি অন্তত দু হাজার কোটি টাকা পাবে না? তাহলে তো পূর্বতন দেনার দায় মেটে। আরও বেশি পেলে এ রাজ্যের বিপিএল. তালিকাভুক্তদের জন্য নিখরচায় জীবনবিমা আর স্বাস্থ্যবিমা করিয়ে দেওয়া যায়।

ইদানীং শিক্ষা এবং পরিকাঠামো উন্নয়ন বাবদ সরকার যে ন্যূনতম খরচও করছে না, আগামী পাঁচ বছরের জন্যে তা দ্বিগুণ কি চতুর্গুণ করে ফেলা যায়। এমনকি সারদার টাকা যারা পায় নি, তাদেরও কিছুটা সাহায্য করা যেতে পারে। এত উন্নয়ন যার থেকে করা সম্ভব, তাকে কালো বলে বিদেশে ফেলে রাখা কি উচিত হচ্ছে? এর পুনরুদ্ধারে জাতীয় সরকারের আরও অনেক বেশি যত্নশীল হওয়া উচিত বলেই মনে হচ্ছে।

উচ্চ আদালতে মোদি সরকার যে তিনটি নাম পেশ করেছে, সেই তিনজনই বড় ব্যবসার সঙ্গে যুক্ত এবং প্রাক্তন চিফ এক্সিকিউটিভ হিসেবে অবসর নিয়েছে তাদের মধ্যে একজন। প্রাথমিক অভিযোগ সরাসরি অস্বীকার করেছে এরা এবং সরকারকে বাকি ৭০০ জনের তালিকা পেশ করতে বলা হয়েছে। সত্যিই তো, ২৫ লক্ষ কোটি টাকার কালো টাকা কি আর তিনজন রাখে? এই টাকার কতটা ব্যবসা থেকে আয়ের অংশ অন্যত্র সরিয়ে ফেলা, আর কতটা ব্যবসা-বহির্ভূত, জমিবাড়ির লেনদেন সংক্রান্ত, ২জি-৩জি-র ঘুষ, বোফর্স/রাফায়েল কেনার ঘুষ, বহুজাতিকের বাজার-দখলের ঘুষ, তার পুঙ্খানুপুঙ্খ হিসেব জানা থাকলে চোর ধরতে সুবিধে হতে পারে।

উমা

স্বাভাবিক তাপমাত্রা

বিবেক সেন

আবহাওয়ার চরিত্র বিভিন্নমুখী। তাপমাত্রা, বায়ুমণ্ডলে জলীয় বাষ্পের পরিমাণ, ঝড়, বৃষ্টি ইত্যাদির সম্মিলিত যে প্রভাব আমরা প্রত্যক্ষভাবে অনুভব করে থাকি, সেটাকেই আমরা আবহাওয়া বলে জানি। আবহাওয়ার এই সব চরিত্রের মধ্যে আমরা সব চাইতে বেশি মাথা ঘামাই বায়ুমণ্ডলে গ্রীষ্মকালে সর্বোচ্চ ও শীতকালে সর্বনিম্ন তাপমাত্রা নিয়ে। সংবাদপত্রে উল্লেখ করা থাকে এই তাপমাত্রা স্বাভাবিকের চেয়ে কত ডিগ্রি কম বা বেশি। কিন্তু তাপমাত্রা কত হলে তাকে স্বাভাবিক বলা যাবে?

আমাদের প্রাত্যহিক অভিজ্ঞতায় এটা জানি যে, গ্রীষ্মকালে বায়ু উত্তপ্ত থাকে ও শীতকালে ঠাণ্ডা। কারণ প্রথম ক্ষেত্রে সূর্যকিরণ প্রায় খাড়াখাড়িভাবে (উল্লম্ব) আসে, শীতকালে আসে তেরছা ভাবে। পাহাড়ের কাছে পাথুরে জমি ও মরুভূমির বালুকাময় অঞ্চল দিনে তাড়তাড়ি তেতে ওঠে, আবার রাতে তাড়াতাড়ি ঠাণ্ডা হয়ে যায়। একইভাবে এই অঞ্চলগুলি গ্রীষ্মকালে বেশি উত্তপ্ত ও শীতকালে বেশি ঠাণ্ডা। সমুদ্রবায়ু উপকূল অঞ্চলে বয়ে আনে গ্রীষ্মকালে অপেক্ষাকৃত শীতল হাওয়া, শীতকালে অপেক্ষাকৃত গরম ইত্যাদি। অর্থাৎ তাপমাত্রা ঋতু ও অঞ্চলটির ভৌগোলিক পরিবেশের ওপর নির্ভরশীল। ঋতু ও ভৌগোলিক পরিবেশের প্রভাব অপরিবর্তনীয়, কাজেই শুধু ঋতু ও ভৌগোলিক পরিবেশের প্রভাবে যে আবহাওয়া বা তাপমাত্রা আমরা পেতাম সেটাকে স্বাভাবিক বা ন্যাচারাল বলে মেনে নেওয়া যেত। কিন্তু সেটা হবার নয়।

আমরা যাকে বাংলাতে স্বাভাবিক তাপমাত্রা বলছি, সংবাদপত্রে ইংরাজিতে সেটা অনুবাদ করা হয় 'নর্মাল' বলে, 'ন্যাচারাল' বলে নয়। বাস্তবে প্রয়োগ অনুসারে একই শব্দ ভিন্ন ভিন্ন অর্থ ধারণ করে। গণিতে ও বিজ্ঞানে সেজন্য একটা সংজ্ঞা দিয়ে শব্দটার অর্থ স্পষ্ট ও নির্দিষ্ট করে নেওয়া হয়। তাই আবহাওয়া বিজ্ঞানে স্বাভাবিক তাপমাত্রা বলতে আমরা কী বোঝাচ্ছি, সেটা স্পষ্ট করে নেওয়া দরকার।

আমরা দেখেছি প্রায়শই চলমান উচ্চচাপ বা নিম্নচাপ তাদের সঙ্গে শীতল বা উত্তপ্ত বায়ু বয়ে নিয়ে এসে উপরোক্ত স্বাভাবিক (ন্যাচারাল) আবহাওয়াকে বিপর্যস্ত করে দেয়। কাজেই কোনো দিনের তাপমাত্রা স্বাভাবিক কিনা সেটা নিশ্চিত করে বলা যায় না। সেইজন্য পরপর কয়েক দিনের তাপমাত্রার গড় মানকে স্বাভাবিক বলে ধরা হয়। প্রথমে একটা বছরকে ৭৩টি ভাগ করে নেওয়া হয়। প্রথম ভাগটি মনে করি, ১লা থেকে ৫ই জানুয়ারি। এই কদিনের গড় মানকে ওই পাঁচদিনের স্বাভাবিক মান ধরা যেতে পারে। তারপর ৬ থেকে ১০ই জানুয়ারি পর্যন্ত তাপমাত্রার গড় মানকে ধরা হবে ৬ থেকে ১০ই জানুয়ারির প্রত্যেক দিনের স্বাভাবিক তাপমাত্রা। এইভাবে নির্ণয় করা হয় বছরের ৭৩টি ভাগের তাপমাত্রা।

কিন্তু এই মানটিও প্রতি বছর একই থাকে না, অল্পস্বল্প কম-বেশি হয় উচ্চচাপ ও নিম্নচাপ অঞ্চলের অনিশ্চিত গতিবিধির দরুন। তাই পরপর ৩০ বছরের এই সময়ের উপরোক্ত গড় মানের আবার গড় নির্ণয় করে সেই মানকে বছরের প্রথম পাঁচদিনের স্বাভাবিক তাপমাত্রা ধরা হয়। এইভাবে প্রথম গড়টি খেয়াল রাখে ঋতু পরিবর্তনের ও দ্বিতীয়টি রাখে বিভিন্ন বছরে আবহাওয়া অঞ্চলের অনিশ্চিত গতিবিধির। আগ্রহী পাঠক লক্ষ্য করে থাকবেন যে, কোনো একটি স্থানের তাপমাত্রা সাধারনত আমাদের নির্ণীত গড় মানের ১ ডিগ্রির মধ্যেই থাকে। যদি পার্থক্য তার বেশি হয় তবে বুঝতে হবে, কোনো নিম্নচাপ বা উচ্চচাপ অঞ্চল স্থানটির দিকে এগিয়ে আসছে। আশা করি, এবার নির্ণীত গড় মানটিকে আলোচিত স্থানটির স্বাভাবিক (নর্মাল) তাপমাত্রা বলে গ্রহণ করতে দ্বিধা হবে না।

যাই হোক, এত কাণ্ড করে তো নর্মালের মানচিত্র তৈরি হল। এবার দেখা যাক, একে কী করে আমাদের ব্যবহারিক কাজে লাগান যায়। শীত-গ্রীষ্মের অনুভূতি মানুষের সহজাত, এর জন্য এত কাণ্ড করার প্রয়োজন হয় না। কিন্তু সেই অনুভূতি সাবজেক্টিভ, ভিন্ন ভিন্ন মানুষের কাছে বিভিন্ন রূপে অনুভূত হয়ে থাকে। বিজ্ঞানে ফলাফল হওয়া চাই অবজেক্টিভ অর্থাৎ ব্যক্তিনিরপেক্ষ। তাপমাত্রার নর্মালের মানচিত্র সেই নিরপেক্ষতা রক্ষা করে।

দিনের তাপমাত্রা সারা দিনে একই রকম থাকে না- সূর্যোদয়ের

পর থেকে (বরং বলা উচিত কয়েক মিনিট পর থেকে) বাড়তে বাড়তে সর্বোচ্চ তাপমাত্রা দাঁড়ায় আড়াইটা থেকে তিনটার মধ্যে এবং তারপর থেকে কমতে কমতে সর্বনিম্ন দাঁড়ায় সূর্যোদয়ের কয়েক মিনিট পরে। গ্রীষ্মকালে প্রায় প্রত্যেক বছরেই কিছু দিন উত্তর ভারতে সর্বোচ্চ তাপমাত্রা স্বাভাবিকের চেয়ে ৫ থেকে ৬ ডিগ্রি বেশি হয়ে যায়। এমন অবস্থার আশঙ্কা থাকলে আবহাওয়া দপ্তর তীব্র দাবদাহের সতর্কবার্তা জারি করে।

সামর্থ্য অনুযায়ী কেউ এয়ারকুলার বা এয়ারকন্ডিশনার চালু করেন, কেউ বা ব্যবস্থা করেন খশখশের। দরিদ্র মানুষ খুব প্রয়োজন না হলে বাড়ীর বাইরে বের হন না। সরকার বা জনকল্যাণ মূলক কিছু প্রতিষ্ঠান এঁদের জন্য আশ্রয় শিবির ও পানীয় জলের ব্যবস্থা করে। অর্থনৈতিক দিক থেকে কিছু ব্যবসায়ী লাভবান হন– কারণ আইসক্রিম, ফলের রস, লস্যি জাতীয় ঠাণ্ডা পানীয়ের চাহিদা তখন অনেক বেড়ে যায়। যাঁরা কুলার ব্যবহার করেন, তাঁদেরও খরচা যেমন বাড়ে তেমনি বিদ্যুৎ সরবরাহকারী সংস্থাকে অতিরিক্ত বিদ্যুৎ উৎপাদনের জন্য প্রস্তুত থাকতে হয়। এই কারণে তীব্র দাবদাহের সতর্কবার্তা বিদ্যুৎ ব্যবহারকারী ও সরবরাহকারী উভয়ের পক্ষেই জরুরি।

অনুরূপভাবে নিম্ন তাপমাত্রা স্বাভাবিকের চেয়ে ৫ থেকে ৬ ডিগ্রি কম হওয়ার আশঙ্কা থাকলে শৈত্যপ্রবাহের সতর্কবার্তা জারি করা হয়ে থাকে। এক্ষেত্রে এয়ারকুলারের পরিবর্তে ব্যবহার করতে হবে রুম হিটার বা এয়ারকন্ডিশনার। প্রয়োজন হবে অতিরিক্ত বিদ্যুতের— যার জন্য প্রস্তুতি নিতে হবে সরবরাহকারী সংস্থাকেও। দরিদ্র মানুষের জন্য ব্যবস্থা করতে হবে সরকারি আশ্রয়স্থল ও জ্বালানীর। তাই এক্ষেত্রেও প্রয়োজন শৈত্যপ্রবাহের সতর্কবার্তা। স্বাভাবিক তাপমাত্রার মানচিত্র যে জনসাধারণের জন্যও সতর্কবার্তা জারি করা প্রয়োজন, সেটা বোঝাতেই এত কথা বলতে হল।

স্বাভাবিক তাপমাত্রার মানচিত্রের আলোচনার আগে দিনের তাপমাত্রা বা তাপমান বলতে আবহাওয়াবিদ কী বোঝাচ্ছেন সেটা গোড়াতেই জানিয়ে রাখা উচিত ছিল। দেরি হলেও এখন সেই ত্রুটি সংশোধন করে নেওয়া যাক। আবহাওয়াবিদের বাহানা অনেক, তিনি চান খোলা জায়গায় মুক্ত হাওয়ার তাপমান। কিন্তু সেখানে সূর্যালোকের প্রবেশ নিষেধ। বায়ুর তাপমাত্রা জানতে হলে তাপমান যন্ত্রটিকে (থার্মোমিটারটিকে) মুক্ত বায়ুর সংস্পর্শে আনতে হবে, অর্থাৎ বাতাসের প্রবাহ বাধামুক্ত খোলা জায়গায় রাখতে হবে, কিন্তু তাপমান যন্ত্রটিকে খোলা জায়গায় রাখলে সেটা সম্ভব নয়। প্রশ্ন হল, তাহলে আমরা দিনের তাপমাত্রা কী করে পাব।

একটু পরিষ্কার করে বলা যাক। সূর্যের কিরণ বায়ুকে সোজাসুজি উত্তপ্ত করতে পারে না, বায়ু ভেদ করে সেটা পৌঁছে যায় পৃথিবীর বুকে। সেখানে মাটি, জল, পাথর, ধাতব বা অধাতব বস্তু অতি ক্ষুদ্র তরঙ্গ দৈর্ঘ্যের সূর্যকিরণকে (সোলার রেডিয়েশন) শোষণ করে উত্তপ্ত হয়। কিন্তু বায়ুর সেই ক্ষমতা নেই। উত্তপ্ত পৃথিবী আবার সেই তাপ দীর্ঘ তরঙ্গ (টেরেস্ট্রিয়াল রেডিয়েশন) রূপে বিকিরণ করে বায়ুকে উত্তপ্ত করে। খোলা জায়গায় রাখলে সেটা থার্মোমিটারের পারদের তাপমান দেখাবে, বায়ুর তাপমান নয়। সমস্যার সমাধান দিলেন একজন আবহাওয়াবিদ, যাঁর ইঞ্জিনিয়ারিং বিদ্যাটাও আয়ত্তে ছিল। তাঁর নাম ছিল স্যার টমাস স্টিভেনসন।

তিনি একটি কাঠের বাক্স তৈরি করালেন, যার চারদিকের দেওয়ালই আমাদের পুরানো আমলের জানালার খড়খড়ির মতো। তফাত এই যে, দেওয়ালগুলির ভিতর ও বাইরের দু দিকেই খড়খড়ি (double louvred) আছে। দ্বিতীয়ত খড়খড়িগুলি কখনই বন্ধ করা যাবে না। ফলে বাইরের বাতাস ভিতরে ঢুকে উল্টোদিকের খড়খড়ি দিয়ে বেরিয়ে যেতে পারবে। এই ব্যবস্থায় সূর্যালোক প্রবেশ করবে না এবং ঝড়বৃষ্টি থেকে যন্ত্রগুলিকে রক্ষা করবে। কিন্তু ভিতরে রাখা থার্মোমিটারগুলি টেরেস্ট্রিয়াল রেডিয়েশন দ্বারা উত্তপ্ত মুক্ত বায়ুর তাপমান সর্বদা ধরতে পারবে। তা ছাড়া বাক্সের ছাদটি দুটো কাঠে ঢাকা, মাঝখানে থাকছে বায়ু। যেহেতু কাঠ ও বায়ু দুটোই তাপের কুপরিবাহী তাই বাইরের সূর্যালোকের তাপ এবং বৃষ্টি ও তুষারের শৈত্য ভিতরের বায়ুকে তপ্ত বা শীতল করতে পারবে না। বাক্সটিকে এবার ৪.১ ফুট লম্বা ৪টি খুঁটির ওপর বসিয়ে খুঁটি সহ পুরো বাক্সটিকে সাদা রঙ মাখিয়ে পালিশ করে দেওয়া হয়। ফলে সূর্যের তাপ বাইরে থেকেই প্রতিফলিত হয়ে যাবে।

শেষকথা হল বাক্সের ভিতরে রাখা থার্মোমিটার বাইরের সূর্যতাপ থেকে রক্ষা করার ব্যবস্থা বোঝা গেল, টেরেস্ট্রিয়াল রেডিয়েশন দ্বারা উত্তপ্ত বায়ুর বাক্সের ভিতরে অবাধ চলাচল মেনে নেওয়া হল। কিন্তু থার্মোমিটার থেকে বায়ুর তাপমান কেমন করে পড়ব? সেজন্য সামনের খড়খড়ি যুক্ত দেওয়ালটি কব্জা লাগানো আছে, যাতে সেটি খোলা ও বন্ধ করা যায়। উদ্ভাবকের নামানুসারে বাক্সটির নামকরণ করা হয়েছে স্টিভেনসন স্ক্রিন। নিচে স্ক্রিনের দুটি ছবি দেখান হয়েছে– বাঁদিকে দরজা বন্ধ অবস্থায়। ডানদিকে সামনের দরজা খোলা অবস্থায় চারটি দেওয়ালের খড়খড়ি এবং সর্বোচ্চ, সর্বনিম্ন, ড্রাই বাল্ব ও ওয়েট বাল্ব থার্মোমিটারের অবস্থান দেখা যাচ্ছে। বর্তমান আলোচনায় শুধু সর্বোচ্চ ও সর্বনিম্ন তাপমানের মানচিত্রের কথা বলা হয়েছে। তাই অন্য থার্মোমিটার দুটির কথা এক্ষেত্রে অপ্রয়োজনীয়।

উমা

কুম্ভমেলায় লক্ষ্য মোক্ষ, মুনাফা

ভাবানীপ্রসাদ সাহু

প্রাচীন ভারতে অসাধারণ সব সাহিত্য সৃষ্টি হয়েছে। ঈশ্বরবিশ্বাস, দেবভক্তি আর সীমাহীন ও সুন্দর সব কল্পনার মিশ্রণে তৈরি সেই সব সাহিত্য, তার গল্পগাথা, যেখানে প্রতিফলিত হয়েছিল তখনকার মানুষের চাওয়া-পাওয়া, সমাজ-সংস্কৃতি, অর্থনীতি। অবশ্য তা মূলত কেন্দ্রীভূত ছিল সমাজের উচ্চবর্গের তথা শাসকশ্রেণীর চাহিদা ও মানসিকতাকে ঘিরে। এমনই এক কাল্পনিক বর্ণনাকে ঘিরে সৃষ্টি হয়েছিল কুম্ভমেলা।

কুম্ভ অর্থাৎ কলসী। অবশ্য সাধারণ কলসী নয়, 'অমৃত' ভরা কলসী, যে অমৃত খেলে মৃত্যুকে জয় করে অমর হওয়া যায়। অভিশাপ থেকে মুক্তি পেতে, দৈত্য-দানব মানব সবার কাছে অজেয় থাকতে তথা মৃত্যুঞ্জয় হতে দেবতারা ঠিক করেছিল সমুদ্রমন্থন করে 'অমৃত' পাবে এবং খাবে। কিন্তু সমুদ্রমন্থন তো চাট্টিখানি কথা নয়। বিশাল মন্দার পর্বতের চারদিকে সুবিশাল বাসুকী নাগকে দড়ির মতো জড়িয়ে পর্বতটিকে নিরন্তর ঘুরিয়ে ঘুরিয়ে এক সময় সমুদ্র থেকে মথিত হয়ে উঠবে অমৃত। কিন্তু এত পরিশ্রমের কাজ তো শুধু দেবতাদের দ্বারা সম্ভব নয়। আগত্যা দেবতারা ঠিক করল, শক্তিশালী দৈত্যদের সাহায্য নেবে। তাদের বলা হল, অমৃত উঠলে তাদেরও ভাগ দেওয়া হবে। দৈত্যরা তো এই লোভে খুশি মনেই সমুদ্রমন্থনে লেগে গেল। একদিকে দেবতারা, অন্যদিকে দৈত্যরা সমুদ্রে পর্বতটিকে ঘুরিয়েই যাচ্ছে, দধিমন্থনের মতো। উঠল লক্ষ্মী, স্বর্গীয় পুষ্প ইত্যাদি এবং অবশেষে অমৃতভরা কলসী, অমৃতকুম্ভ। দু পক্ষই বেজায় খুশি।

কিন্তু দেবতারা দেখল, দৈত্যদেরও যদি অমৃত খাওয়ানো হয়, তাহলে ওরাও অজেয় অমর হয়ে উঠবে! এমনিতেই ব্যাটাদের জ্বালায় মাঝে মাঝেই প্রাণ ওষ্ঠাগত হয়, তার ওপর অমৃত খেলে তো সোনায় সোহাগা। তাই তারা ঠিক করল, প্রতিশ্রুতি ভঙ্গ করবে। কোনোভাবে অমৃতকুম্ভটিকে সরিয়ে ফেলা হবে। ঠিক হল নারায়ণ মোহিনী নারীবেশে অমৃতভরা কলসীটিকে 'চুরি' করে পালাবে আর দৈত্যদের বলা হবে অমৃতকুম্ভ খুঁজে পাওয়া যাচ্ছে না। পরিকল্পনা অনুযায়ী 'মোহিনী' কুম্ভটি নিয়ে দে ছুট। তা অনেক দূরে নিয়ে গিয়ে লুকিয়ে ফেলতে হবে। কিন্তু ভারী কলসী নিয়ে এক নাগাড়ে ছুটে যাওয়া তো মুশকিল, সে যতই নারায়ণ হোক না কেন। তাই মাঝে মাঝে তাকে মাটিতে নামিয়ে রাখতে হল। অমৃতকুম্ভ নামানোর এই জায়গা হল অধুনা মহারাষ্ট্রের নাসিক, মধ্যপ্রদেশের উজ্জয়িনী, উত্তরপ্রদেশের প্রয়াগ (বা এলাহাবাদ) আর উত্তরাখণ্ডের হরিদ্বার। ঐ জায়গাগুলো অমৃতকুম্ভের ছোঁয়া পেয়েছে, নামানোর সময় দু-চার ফোঁটা চলকে মাটিতে পড়েও হয়তো গিয়েছিল। তাই স্থানগুলি হয়ে গেল পুণ্যভূমি! বিশ্বাসী ভক্তজন পুণ্যলোভে ঐ স্থানগুলিতে জড়ো হতে থাকেন। শুরু হয় 'কুম্ভমেলা', ছ বছর অন্তর অর্ধকুম্ভ, বারো বছর অন্তর পূর্ণকুম্ভমেলা। সংক্ষেপে এই হচ্ছে কুম্ভমেলার ইতিবৃত্ত। কিন্তু যতই তাতে কল্পনা থাকুক না কেন, তথাকথিত হিন্দুরা বহুশত বছর ধরে এই মেলায় গিয়ে স্নান করে পাপক্ষালন করে। তাদের বিশ্বাস, এর ফলে পুণ্য অর্জন করা যায়। সরল ধর্মবিশ্বাসী লাখো লাখো মানুষ জড়ো হন ঐ মেলায়।

আর এখন শুরু হয়েছে ঐসব সরলবিশ্বাসী মানুষদের মাথায় টুপি পরিয়ে নতুন রাজনৈতিক আর ব্যবসায়িক খেলা। যেমন এই ২০১৯-এর ১৫ জানুয়ারি থেকে ৪ মার্চ অবধি চলা প্রয়াগের (এলাহাবাদের) অর্ধকুম্ভমেলাকে হিন্দুত্ববাদী রাজনৈতিক ব্যক্তিরা বিশালভাবে সাজিয়ে-গুছিয়ে ভক্তদের সামনে হাজির করছে, চলেছে হিন্দুত্ববাদী প্রচার, যা পরবর্তী নির্বাচনে ভোটবাক্সে প্রতিফলিত হতে পারে। অন্যদিকে নানা ব্যবসায়িক প্রতিষ্ঠান ঝাঁপিয়ে পড়েছে তাদের পণ্যের প্রচারে, যা মুনাফার বাক্স ভরে দেবে।

উত্তরপ্রদেশ সরকার এই অর্ধকুম্ভমেলার জন্য কম করে ২৮০০ কোটি টাকা খরচ করেছে। নানাবিধ প্রচারমূলক সাংস্কৃতিক কাজ, পর্যটনশিল্প আর ভক্তদের সুবিধা ও নিরাপত্তার জন্য এই বিপুল খরচ। প্রায় ৩২০০ হেক্টর জুড়ে চলা এই মেলায় অসংখ্য অস্থায়ী তাঁবু ফেলা হয়েছে। ১,২০,০০০ শৌচাগার, ৪০০০০ এলইডি আলো, ১৪০০ সিসি টিভি ক্যামেরা আর স্নানঘাটের কাছে জামাকাপড় বদলাবার জন্য অজস্র ঘরের ব্যবস্থা করা হয়েছে। অর্ধকুম্ভমেলায় কম করে ১৫ কোটি মানুষের সমাগম হয়েছে।

এই ১৫ কোটি মানুষ, মানে এত কোটি ভোটার শুধু নয়, খদ্দেরও। 'দ্য হিন্দু'-র ১১ জানুয়ারি ২০১৯ 'বিজনেস লাইন'-এ কুম্ভমেলার ব্যবসায়িক তৎপরতা নিয়ে চিত্রা নারায়ণনের একটি প্রতিবেদন প্রকাশিত হয়; তথ্য সহায়তায় ছিলেন অমৃতা নায়ার

ঘাসওয়ালা। এই প্রতিবেদন থেকে বোঝা যায়, কীভাবে কোটি কোটি পুণ্যার্থী একদিকে যেমন প্রয়াগের সঙ্গমে ঝাঁপিয়ে পড়ছেন স্নান করে মোক্ষলাভের আশায়, অন্যদিকে ব্যবসায়ীরা তাদের ওপর ঝাঁপিয়ে পড়ছে ভবিষ্যতের ব্যবসা আর মুনাফার আশায়। ব্যবসায়িক প্রচারের জন্য কুম্ভমেলাকে বেছে নেওয়ার প্রধান কারণ শুধু পৃথিবীর সর্ববৃহৎ এই মেলায় একটি স্থানে এত কোটি মানুষের সমাগমের জন্য নয়, এই সব মানুষদের মধ্যে ধনী–গরিব নানাস্তরের মানুষ যেমন আছেন, তেমনি তাঁরা আসছেন দেশের নানা প্রান্ত থেকে। মেলার 'পুণ্য নিয়ে' এবং ব্যবসায়িক প্রচারের স্মৃতি নিয়ে তাঁরা বলতে গেলে সারা ভারতে ছড়িয়ে পড়বেন। অর্থাৎ একটি জায়গায় প্রচার করে সারা দেশে ঐ বার্তা ছড়িয়ে দেওয়া সম্ভব।

ডাবর যেমন বিভিন্ন স্বাদের হজমোলার সুকৌশলী প্রচারের ব্যবস্থা করেছে। এর জন্য সমাগত ভক্তদের মধ্যে নানা ধরনের হজমোলা ঢালাও বিলি করা হয়েছে, এক–একটি ধরনকে নির্বাচনে দাঁড়ানো এক–একজন প্রার্থী হিসেবে চিহ্নিত করে ভোট দিতে বলা হয়েছে। মেলার শেষে তার ফলাফল প্রকাশ করে ভোটদাতাদের পুরস্কৃত করা হয়। অর্থাৎ প্রয়াগ সঙ্গমে স্নান করে শুধু পুণ্য নয়, বিনি পয়সায় হজমোলাও পাওয়া গেছে, সঙ্গে আবার কারও কারও পুরস্কারও জুটেছে। পুরো ব্যাপারটার নাম দেওয়া হয়েছে 'টেস্ট ইলেকশন হজমোলা' অর্থাৎ হজমোলার স্বাদের নির্বাচন।

ডাবর আরেকটি নতুন পণ্য কুম্ভমেলার চালু করেছে— দাঁত–স্নান। তাদের লাল টুথপেস্ট তো ছিলই, সঙ্গে এই পণ্যটিকে দাঁতে ও মাড়িতে ভালভাবে ছড়িয়ে দেওয়ার (ডাবর রেড টুথপেস্ট ডিস্পেন্সার) কাজও করবে বলে দাবি করা হচ্ছে। অধিকাংশ ফাইভস্টার হোটেলে যেমন 'লিকুইড সোডা ডিস্পেন্সার' দেওয়া হয়, এটাও তারই মতো, তবে শুধু দাঁতের ও মাড়ির জন্য। বলা হচ্ছে এর জন্য দাঁত ও মুখের স্বাস্থ্য ভালো থাকবে। এর জন্য মেলা জুড়ে প্রবচনের মতো বলা হয়েছে, 'ক্যা আপনে দাঁত স্নান কিয়া?' এই কথাটি। এ ক্ষেত্রে তাদের মূল লক্ষ্য গ্রামীণ খদ্দের। তাদের মুখ্য আধিকারিক স্পষ্টই জানিয়েছেন, কুম্ভের মতো অসাধারণ একটি ঘটনা অর্থাৎ মেলার সঙ্গে যুক্ত করতে পারলে তা মানুষের মধ্যে ছাপ ফেলে অনেক বেশি।

অন্যদিকে বিড়লা কর্পোরেশন তাদের 'পারফেক্ট সিমেন্ট'–এর প্রচারের জন্য নাম লেখা, মাথায় বাঁধার ফেট্টি (হেড ব্যান্ড) দু লক্ষ বিলিয়েছে। সঙ্গে কাপড় পাল্টানোর ৭০টি ঘরকেও তারা প্রচারের জন্য কাজে লাগিয়েছে।

এশিয়ার সর্ববৃহৎ টেরি টাওয়েল উৎপাদক 'ওয়েলস্পান' এই প্রথম কুম্ভমেলার এসেছে দেশজুড়ে তাদের তোয়ালের বাহার গড়ে তোলার জন্য। 'দিব্য কুম্ভ ভব্য কুম্ভ' স্লোগান দিয়ে তাদের এই তোয়ালের গুণাবলী এক কথায় বলেছে 'টাওয়েল জো জলদি শুখে অওর জলদি শুখায়ে।' 'কুইক ড্রাই টাওয়েল' নামের এই তোয়ালেটি পাশ্চাত্যে গত অক্টোবরে বাজারে ছাড়া হয়েছে, এবার লক্ষ্য ভারত এবং তার উপায় এ দেশের এই কোটি কোটি কুম্ভ–পুণ্যার্থীর স্নানের পর তাড়াতাড়ি গা মুছিয়ে দেওয়া। এদ্দিন তারা বাইরে রফতানি করত। এখন দেশের অভ্যন্তরীণ বাজার ধরার জন্য ঝাঁপিয়েছে। মেলায় কাপড় চাদরের জন্য ২০টি ঘরকে তারা নিয়েছে এবং সেগুলিতে বিনামূল্যে তোয়ালে বিলিয়েছে। পরীক্ষামূলক এই সংযোগ প্রক্রিয়ায় কম করে পাঁচ লক্ষ মানুষকে তারা ছুঁতে পেরেছে। আটা, তিল ও অন্যান্য গৃহস্থালি জিনিসপত্রের বাজার তারা ২০ বছর আগেই ধরেছিল। এবার জানিয়েছে, তোয়ালেতে ব্র্যান্ড বিপ্লবের কথা এবং ভারতের শতকরা ৬৫ ভাগ তোয়ালে ব্যবসা যে অসংগঠিত বাজারের দখল নেওয়া।

পাশাপাশি পতঞ্জলির জন্য সাধারণ প্রচার ছাড়া অন্য কিছু করার দরকার হয়নি, কারণ তাদের প্রধান ব্যবসায়িক মুখ বাবা রামদেবই মেলায় ছিলেন। জুনাগড় আখড়ার মতো বড় আখড়ায় তার উপস্থিতি আর মেলায় ঘোরাই পতঞ্জলির বড় প্রচার। পতঞ্জলির মুখপাত্র এস কে তিজারাওয়ালাও স্পষ্টই এ কথা জানালেন, 'ব্যবসায়িক মুখ' (ব্র্যান্ড আইকন) হিসেবে বাবা রামদেবের চেয়ে বড় আর কিছু হতে পারে না।

এইভাবে আরো অজস্র ছোট–বড় ব্যবসায়িক প্রতিষ্ঠান কুম্ভমেলার কয়েকদিন প্রয়াগে তাদের ব্যবসায়িক আখড়া গড়ে তুলেছিল। যেমন আখড়ায় গেড়ে বসেছিল নানা নামের নানা ধরনের সাধুসন্ন্যাসী, বাবাজি–স্বামীজিদের মতো ধর্মব্যবসায়ীরাও। দু পক্ষই এক জায়গায় এত সরলবিশ্বাসী মানুষদের পেয়ে তাদের নিজ নিজ ব্যবসা গোছানোর ধান্দা করেছে।

অথচ যদি সুমদ্রমন্থন তথা কুম্ভমেলার সৃষ্টির ঐ পৌরাণিক গল্পটা কেউ একটু ঝালিয়ে দেখেন, তাহলে কয়েকটি ব্যাপার স্পষ্ট বোঝা যায়, যেমন—

(১) যে সব দেবতাকে মানুষ অলৌকিক ক্ষমতাধর, সর্বশক্তিমান ইত্যাদি ভাবেন, তারা আদৌ অজর–অমর নয়, কোনো অলৌকিক ক্ষমতাও নেই যে তার দ্বারা তাঁরা নিজেদের রোগ ও মৃত্যুকে ঠেকাতে পারে, না হলে তারা অমৃত পাওয়ার জন্য এত চেষ্টা করতেন না।

(২) একইভাবে তাদের শক্তি ও ক্ষমতাও অতি সীমিত, না হলে সাপটিকে ঘোরানোর জন্য দৈত্যদের সাহায্য ভিক্ষা করতে হাত না। আর মোহিনীবেশী নারায়ণকেও ভারি কলসী না বইতে পেরে বারবার নামিয়ে রাখতে হত না।

(৩) ঐসব দেবতারা মিথ্যাবাদী, প্রতারক, প্রবঞ্চক। দৈত্যদের প্রতিশ্রুতি দিয়ে, অমৃতের লোভ দেখিয়ে তাদের খাটিয়ে নিয়েও তারা অমৃত চুরি করার মতো হীন কাজ করতে পিছুপা হয়নি।

এগুলিই প্রমাণ করে যে, আসলে ঐভাবে দেবদেবী বলে কেউ

নেই, কোনদিন ছিলও না, সবটাই মানুষের কল্পনা, মানুষই তাদের নিজেদের কল্পনায় নিজেদের মতো করে সৃষ্টি করেছে। চেহারাও মানুষের মতো, চরিত্রও কমবেশি তাই, শুধু ভক্তি করা আর তাদের পূজা করে নিজেদের স্বার্থসিদ্ধি করার চেষ্টায় ঐ সব দেবদেবীর ওপর মানুষ কিছু অলৌকিক ক্ষমতার রঙ লাগিয়েছে। (৪) শেষ অবধি আমরা জানি, দেবতারা দৈত্যদের লুকিয়ে ঐ চুরি করা অমৃত নিয়েপঙ্‌ক্তিভোজনে বসেছিল। ঐখানে রাহু ও কেতু নাম দুই দৈত্যও লুকিয়ে বসে পড়েছিল। অমৃত তাদের গলা অবধি পৌঁছতে না পৌঁছতেই চন্দ্র আর সূর্য দেবতা তাদের চিনে ফেলে। ফলে নারায়ণ সুদর্শনচক্র দিয়ে তাদের গলা কেটে দেয়। ঐ কাটামুন্ড নিয়ে রাহু ও কেতু আকাশে ঘুরে বেড়ায় আর সুযোগ পেয়ে চন্দ্র-সূর্যকে গিলে নেয়, কিন্তু মুণ্ডু তো কাটা, তাই চন্দ্র-সূর্য আবার বেরিয়ে যায়, ঐভাবে হয় সূর্য আর চন্দ্রগ্রহণ। আর যেহেতু রাহু-কেতুর গলা অবধি অমৃত পৌঁছেছিল তাই তাদের কাটামুণ্ডু দুটি অমর হয়ে আকাশে ঘুরে বেড়াচ্ছে। তাই যদি হত তবে যেসব দেবতা অমৃত খেয়েছিল তাদেরও তো অমর হয়ে থাকবার কথা। তেত্রিশ কোটি না হোক দু-চার হাজার এমন অমর দেবতা তো চারপাশে ঘুরঘুর করত। কিন্তু যতই দেবদেবীতে বিশ্বাস থাকুক না কেন, এত বছরে কোনো অমর দেবদেবীকে কোনো ভারতবাসী বা বলা ভাল হিন্দু দেখতে পেয়েছেন বলে শোনা যায় নি। আসলে দেখতে পাওয়া তো সম্ভব নয়, কারণ ঐ অমৃত, অমৃতভরা কুম্ভ, ইত্যাদি সবই ছিল প্রাচীন ভারতের কিছু অসাধারণ সাহিত্যিকের রচিত চিত্তাকর্ষক গল্পই। গল্পটা যখন এই, এবং আগে যা কথা বলা হল তা সাধারণ বুদ্ধিতে বোঝা গেলেও, ঐ অলীক অমৃতের অস্তিত্বহীন কুম্ভটিকে কোথায় কোথায় রাখা হয়েছিল, গল্পের ওই বর্ণনা অনুযায়ী আধুনিক ভারতে কুম্ভমেলা ঠিক হয়ে চলেছে। স্নান করে, মোক্ষলাভের আশায়, কোটি কোটি বিশ্বাসী মানুষ যেখানে জড়ো হচ্ছেন, রাষ্ট্রও বহু অর্থ ব্যয় করে ঐ বিশ্বাসকে শক্তিশালী করে চলেছে। আর রাজনৈতিক-অরাজনৈতিক ধর্মব্যবসায়ীরা এবং পুঁজিপতিরা তার সুযোগ নিয়ে তাকে কাজেও লাগাচ্ছে। এই ব্যবস্থার সঙ্গে তা সঙ্গতিপূর্ণও বটে !

উমা

শ্যামল গুহ প্রয়াত

(২০/০৯/১৯৩৮ - ০৩/০৪/২০১৯)

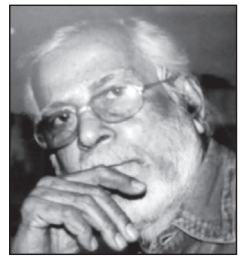

ফটোগ্রাফি নিয়ে যাঁরা একটু-আধটু খবর রাখেন, তাঁদের কাছে সি গুহ ও তাঁর ষ্টুডিও বেশ পরিচিত নাম। সেই স্টুডিওঘরটিকে সম্পূর্ণ অবাণিজ্যিকভাবে সাংস্কৃতিক চর্চা কেন্দ্র হিসেবে গড়ে তোলার কথা ভেবেছিলেন সদ্যপ্রয়াত শ্যামল গুহ। সি গুহ মানে চারু গুহর কনিষ্ঠ সন্তান। যে অঞ্চলে এক চিলতে জায়গা পাওয়ার জন্যে লাখ লাখ টাকার সেলামির লেনদেন চলে, সেখানে এই এত বড় জায়গা নিজের খরচে সারাই করে ভাল কাজের জন্যে ব্যবহার করতে দেওয়ার মতো দুঃসাহস তথা ঔদার্য দেখাতে পেরেছিলেন শ্যামল গুহ। অক্লেশে বহু টাকা কামিয়ে নিতে পারতেন, করেননি। তাই 'বই-চিত্র' হয়ে উঠেছে কলেজ স্ট্রিটের অন্যতম ল্যান্ডমার্ক। কফি হাউস যেমন, তেমনই। সাংস্কৃতিক কর্মকাণ্ডের পীঠস্থান। একেবারে নির্ভেজাল সুস্থ সংস্কৃতির চর্চাকেন্দ্র। নামমাত্র খরচের কারণে কলেজে স্ট্রিট অঞ্চলে 'বই-চিত্র' হয়ে উঠেছিল ছোটখাটো সংগঠনের সাংস্কৃতিক অনুষ্ঠান আয়োজনের ঠিকানা।

উৎস মানুষ পত্রিকার প্রয়াত সম্পাদক অশোক বন্দ্যোপাধ্যায় ছিলেন শ্যামল গুহর বন্ধু। সেই সূত্রে অচিরেই তিনি হয়ে ওঠেন আমাদের শ্যামলদা। উৎস মানুষ যাতে ঠিকমতো বেরোয় শ্যামলদা তা চাইতেন। বন্ধু অশোকের প্রয়াণের পর নানাভাবে সাহায্যের হাত বাড়িয়ে দিয়েছেন। উৎস মানুষ পত্রিকা ও প্রকাশনার বইগুলো শ্যামলদার উৎসাহেই বই-চিত্রে রাখা হয়। অনেকের মত শ্যামলদাও চাইতেন সাধারণ মানুষের ভাত-কাপড়ের সংস্থান হোক, সমাজটা অন্যরকম ভাবে পাল্টাক। ফুটবলপ্রেমী শ্যামল গুহ বাঙালির ফুটবল খেলা নিয়ে চমৎকার তথ্যচিত্র তৈরি করেছিলেন। বই-চিত্রর ঘরে তা দেখানো হয়েছিল। শ্যামল গুহ বলতে গল্ফ টুপি মাথায়, কাঁধে কাপড়ের শান্তিনিকেতনী ব্যাগ ঝোলান যে শৌখিন মানুষটির চেহারা চোখের সামনে ভেসে ওঠে, বই-চিত্র ছিল তাঁর প্রাণ। সাহানগর (কেওড়াতলা) শ্মশানে শ্যামলদার অতি কাছের মানুষ বলছিলেন, মৃত্যুর সঙ্গে লড়াইয়ের শেষ পর্যায়ে হাসপাতালের বিছানায় শুয়েও বই-চিত্রর খবর নিয়েছেন। কারা কারা আসা-যাওয়া করছেন তা না জেনে হাঁফিয়ে উঠছিলেন। বই-চিত্রর শ্যামলদা-র আন্তরিক ব্যবহার, দরকারে সহযোগিতার হাত বাড়িয়ে দেওয়া, কোনোদিন ভোলা যাবে না। ওঁর মতো একজন শুভানুধ্যায়ীকে হারিয়ে আমরা শোকাহত।

উমা

ছুটে বা হেঁটে এসে দাঁড়িয়ে পড়বেন না আচমকা জ্ঞান হারাতে পারেন

গৌতম মিস্ত্রি

সারাদিন অফিসের চেয়ারে বসে থাকার পরে প্রাত্যহিক ছ কিলোমিটার হনহনিয়ে হেঁটে এসে বাড়ির দোরগোড়ায় একটু দাঁড়াতে হয়, পিঠের ব্যাগ থেকে চাবি বের করার জন্য। পা নাড়ালে একটু ব্যায়াম হয়, হৃদ্‌স্পন্দনের গতি বাড়ে আর তার দৌলতে রক্তপ্রবাহ বাড়ে এটা অনেকেই জানেন। আমিও জানতাম। ষাট ছুঁই ছুঁই বয়সে এই প্রথম খেয়াল হল, হঠাৎ হাঁটা থামিয়ে দিলে সময় খেয়াল করে পা দুটো না নাড়াতে থাকলে মাথাটা ঝিম ঝিম করে। কারণটা আর কিছু নয়, ওই সময় মাথায় প্রয়োজনের চেয়ে কম রক্ত যায়। ব্যাপারটা পরিষ্কার হয়, অ্যাথলিটদের দৌড়তে দেখলে। ওরা দৌড় শেষ করে ফিতে ছুঁয়ে ফেলার পরেও আস্তে আস্তে খানিকটা দৌড়ে নেয়। কারণটা একই। আর সেটা বুঝতে পারলে এটাও বোঝা যাবে, মাঝবয়স পেরিয়ে-যাওয়া মানুষ মাছের বাজারে দাঁড়িয়ে থাকতে থাকতে কেন মাথা ঘুরে ক্ষণিকের জন্য অজ্ঞান হয়ে পড়ে যান, কেনইবা পোস্ট অফিসে বা ব্যাঙ্কের লাইনে বুড়ো-বুড়িরা খামোখা সামান্য সময়ের জন্য মূর্ছা যান। আবার মাঝরাতে ঘুমচোখে টয়লেট সারার সময় বা কমোডে বসে কাজ সারার পরে দাঁড়ানোর সময় কেনই বা মাঝবয়স পেরনো প্রবীণ নাগরিক বেমক্কা ভিরমি খান। এঁদের অধিকাংশেরই হৃদরোগ বা মস্তিষ্কের রোগ আছে, এমন নয়। এই যে হঠাৎ অজ্ঞান হয়ে পড়ে যাওয়া, এর অনেক কারণ থাকতে পারে, যার মধ্যে দুটোর জন্য চিকিৎসা হাঙ্গামার প্রয়োজন।

প্রথমত, হৃৎপেশিতে অভ্যন্তরীণ তড়িৎ প্রবাহ বাধা পেলে, যাকে চলতি ভাষায় 'হার্ট ব্লক' বলে, হৃদ্‌স্পন্দনের হার বিপদসীমার নিচে নেমে যায়। মস্তিষ্কে রক্ত ঠিকমতো পৌঁছতে পারে না। আক্রান্ত ব্যক্তি জ্ঞান হারান। প্রসঙ্গত মনে করিয়ে দিই, হৃৎপিণ্ড একটি পাম্প। ভেতরটা ফাঁপা। বেশ কিছু রক্তবাহী নালী গায়ে জোড়া আছে। হৃৎপিণ্ডের চারপাশের দেওয়ালটা বিশেষ মাংসপেশি দিয়ে তৈরি। যার অবিরাম ও নির্ভুল সঙ্কোচন-প্রসারণে সমস্ত শরীরে রক্তপ্রবাহ চালু থাকে। যার দৌলতেই নগণ্য আমি, আপনি থেকে আর যত সব হোমরাচোমরা, বেঁচেবর্তে আছি। হৃৎপেশির সঙ্ঘবদ্ধ ক্রিয়ায় শরীরে ও চেতনায় রক্তের জোগান অক্ষুণ্ণ থাকে। আমাদের নাচনকোঁদনের জন্য হৃৎপিণ্ডকেও তার চলার ছন্দকে দ্রুতলয়ে নিয়ে যেতে হয়। পেশিগুলো বিশ্রামে থাকলে যে পরিমাণ রক্তে কাজ চলে, তার চেয়ে বেশি রক্তের জোগান চাই। এই যে খানিকটা বেশি রক্ত পেশিতে পৌঁছতে হচ্ছে বলে মস্তিষ্কের যে রক্তের কোটা, তাতে কাটছাঁট করা চলে না। ওদিকটা ঠিক রেখে পেশিতে বেশি রক্ত পাঠানো সম্ভব হয় হৃদ্‌স্পন্দনের হার দ্রুততর করে। রক্তনালীতে রক্তের স্রোত বেশ কয়েকগুণ বাড়িয়ে। হৃদ্‌স্পন্দনের গতি নিয়ন্ত্রিত হয় হৃৎপিণ্ডের ভেতরে ডানদিকের ওপরের প্রকোষ্ঠের (রাইট অ্যাট্রিয়াম) ওপরের দিকে থাকা প্রাকৃতিক পেসমেকার নামে এক বিশেষ ধরনের কোষকলা (টিস্যু) থেকে উৎপন্ন তড়িৎ থেকে। হৃদ্‌পেশিকে সঙ্কোচনে উত্তেজিত করার জন্য উৎপন্ন তড়িৎ বিশেষ তড়িৎপ্রবাহী 'কন্ডাক্টিং টিস্যু'-র মাধ্যমে বিদ্যুৎগতিতে হৃৎপিণ্ডের অন্তিম প্রকোষ্ঠের (রাইট ও লেফ্‌ট ভেন্ট্রিক্‌ল) পেশিতে ছড়িয়ে পড়ে সেই দুই প্রকোষ্ঠের পেশিকে একসঙ্গে সঙ্কোচন করায়। হৃৎপেশির একসঙ্গে সঙ্কোচন না হলে কার্যকার পাম্প করা হবে না। জল ভরা বেলুনের এক পাশটা টিপে ধরলে যেমন বেলুনের অন্য দিকটা কেবল ফুলে উঠবে, বেলুনের একদিকের ফুটো দিয়ে জল বেরোবে না। হৃৎপিণ্ডের প্রাকৃতিক পেসমেকারে নির্দিষ্ট ছন্দে ও হারে তড়িৎ উত্তেজনা উৎপন্নে ঘাটতি পড়লে, যেটাকে 'সাইনাস নোড'-এর রোগও বলা যায় (তাপবিদ্যুৎ কেন্দ্রের সবকটা ইউনিট একসঙ্গে খারাপ হয়ে গেলে যেমনটি হয়) অথবা সবকটা তড়িৎপ্রবাহী 'কন্ডাক্টিং টিস্যু' একসঙ্গে বিগড়ে গেলে (যেমন গ্রিড ফেলিওর বা কেবল ফল্ট হলে হয়) চিকিৎসকেরা বলেন 'হার্ট ব্লক'

হয়েছে। কৃত্রিম পেসমেকার বসিয়ে সহজেই সেই সমস্যার সমাধান করা যায়। আশার কথা, অজ্ঞান হওয়া মানুষদের মধ্যে হার্ট ব্লকের রুগীর সংখ্যা নগণ্য। বলাই বাহুল্য, এই হার্ট ব্লক হৃৎপিণ্ডের রক্তনালীর সরু হয়ে যাওয়ার সমস্যা, খানদানি করোনারি আরটারি ডিজিজ (coronary artery disease, ischaemic heart disease) নয়।

দ্বিতীয়ত, মস্তিষ্কের বিশেষ বিশেষ উত্তেজনাপ্রবণ অঞ্চল থেকে অনিয়ন্ত্রিত ও শক্তিশালী তড়িৎপ্রবাহ শুরু হলেও মানুষ কিছু সময়ের জন্য অজ্ঞান হয়ে যায়। এটা মৃগীরোগ অর্থাৎ এপিলেপ্সি। আশার কথা, আপাত-সুস্থ যে সকল মানুষ রাস্তাঘাটে, বাড়িতে বা অফিসে ক্ষণিকের জন্য হঠাৎ অজ্ঞান হয়ে যান, তাঁদের অধিকাংশই এই দুই রোগের মধ্যে কোনোটার কারণে অজ্ঞান হন না। হার্ট ব্লক আর মৃগীরোগ ছাড়া ক্ষণিকের জন্য মাথা ঘুরে যাওয়া বা অজ্ঞান হয়ে যাওয়ার রোগে যে সকল মানুষ ভোগেন, তাঁদের একটা বড় অংশ একটা মামুলি কারণে অজ্ঞান হয়ে যান, যেটার নাম 'ভেসো-ভেগাল অ্যাটাক'।

এটার আবার রকমফের আছে। আছে নানান গালভরা নাম: নিউরো-সারকুলেটরি সিঙ্কোপ (Neuro-circulatory syncope), নিউরো-কার্ডিওভাস্কুলার সিঙ্কোপ, অর্থোস্ট্যাটিক হাইপোটেনশন ইত্যাদি। আমাদের আলোচনা এই ভেসো-ভেগাল অ্যাটাক নিয়েই। হার্ট ব্লক আর মৃগীরোগের আলোচনা তাই এড়িয়ে যাব। কারণ সেই আলোচনা আমাদের আলোচ্য বিষয়টাকে লঘু করে দেবে। 'নিউরো-সারকুলেটরি সিঙ্কোপ' নামটা খটমট হলেও এটা মোটেই আতঙ্কের নয়। এটা ঘটে গেলে, প্রথমে হার্ট ব্লক আর মৃগীরোগের সম্ভাবনা নির্ভরযোগ্যভাবে বাতিল করে নিতে হবে। পড়ে-থাকা ভেসো-ভেগাল অ্যাটাকের জন্য বিশেষ কিছু জটিল চিকিৎসার প্রয়োজন নেই। কী করতে হবে সেটা আলোচনার আগে নিউরো-সারকুলেটরি সিঙ্কোপ রোগের ব্যাপারটা বুঝে নিতে হবে। নিউরো শব্দের অর্থ স্নায়ু আর সারকুলেটরি শব্দের অর্থ প্রদক্ষিণ বা পরিবেষ্টন করে এমন জিনিস। আর সিঙ্কোপ হল জ্ঞান হারিয়ে ফেলা। সব মিলিয়ে নিউরো-সারকুলেটরি সিঙ্কোপ হল মস্তিষ্কে প্রয়োজনীয় রক্তপ্রবাহের (হৃৎপিণ্ড আর রক্তনালী) কাজের তদারকিতে থাকা স্নায়ুর ক্ষণিকের নিয়ন্ত্রণ হারিয়ে ফেলার কারণে অজ্ঞান হওয়ার রোগ।

অন্য যে কোনো জীবের মতো মস্তিষ্ক মানুষেরও সবচেয়ে গুরুত্বপূর্ণ অঙ্গ। কেবলমাত্র মস্তিষ্কে যথেষ্ট ও নিরবচ্ছিন্ন রক্তপ্রবাহ বজায় রাখার জন্য আমাদের শরীরে একটা 'ভিআইপি' পদমর্যাদার পরিষেবা আছে। গুরুত্বপূর্ণ অঙ্গ হিসাবে উপলব্ধ রক্তের জোগানের মধ্যে প্রয়োজনীয় রক্তের ভাগ যাতে মস্তিষ্কে পৌঁছয় সেটার তদারকি করে স্নায়ু আর রক্তনালীর স্বয়ংক্রিয় ব্যবস্থা, চিকিৎসা বিজ্ঞানের পরিভাষায় যেটার নাম 'সেরিব্রাল অটো-রেগুলেটরি সিস্টেম'। মস্তিষ্কের সক্ষম কর্মকাণ্ডে শক্তির প্রয়োজন সর্বাধিক গুরুত্ব পেয়ে থাকে। শক্তি অর্থাৎ গ্লুকোজ আর অক্সিজেনসমৃদ্ধ রক্তের প্রবাহ যাতে বেশি বা কম না হয় সেইদিকটা তদারকি করে সেরিব্রাল অটো-রেগুলেটরি সিস্টেম। ডেঙ্গি, আন্ত্রিক রোগ, রক্তক্ষরণ, হার্ট অ্যাটাক ইত্যাদি হাজারো রকমের ঝামেলায় যখন রক্তের চাপ কমে যায়, তখন সর্বশক্তি দিয়ে, অন্যান্য অঙ্গকে তাৎক্ষণিক সময়ের জন্য বঞ্চিত করে মস্তিষ্কে প্রয়োজনীয় রক্তের জোগানের বন্দোবস্ত করে এই 'অটো-রেগুলেটরি সিস্টেম'। ওই সময়ে মাংসপেশি, চামড়া এমনকি কিডনিতে রক্ত সরবরাহকারী নালীগুলিকে সঙ্কুচিত করে মস্তিষ্কের রক্তনালীগুলিকে প্রসারিত রেখে রক্তের সিংহভাগ মস্তিষ্কে পৌঁছে দেওয়ার বন্দোবস্ত করে এই ব্যবস্থা। অন্যান্য অঙ্গপ্রত্যঙ্গ পোড় খাওয়া, ধকল সইতে পারা। ওরা কিছু সময়ের জন্য কম রক্ত দিয়ে কাজ চালিয়ে নিতে পারে। মস্তিষ্ক বড়ই আহ্লাদী অঙ্গ, দু-তিন মিনিট বা তার বেশি সময় রক্তপ্রবাহে ঘাটতি পড়লেই বিগড়ে যায়। ফল চেতনা লুপ্তি। অটো-রেগুলেটরি সিস্টেম সীমান্ত পাহারায় জওয়ানের মতো প্রখর দৃষ্টিতে রক্তচাপের বাড়া-কমা লক্ষ্য করতে থাকে। মস্তিষ্কে উপযুক্ত রক্তের প্রবাহ বজায় রাখতে গিয়ে রক্তচাপ কমে গেলে মস্তিষ্ককে বাদ দিয়ে অন্যান্য অঙ্গের রক্তনালীকে সঙ্কুচিত করে সেদিকের রক্তপ্রবাহে কাটছাঁট করে দেয়।

হৃৎপিণ্ড পাম্প করে গোটা শরীরে রক্তের মাধ্যমে জ্বালানি হিসাবে গ্লুকোজ আর অক্সিজেন পৌঁছে দেয়। অঙ্গপ্রত্যঙ্গের কোষে বেশ কিছুটা গ্লুকোজ আগের থেকেই মজুত থাকলেও যথেষ্ট অক্সিজেন মজুত থাকে না। তাই শক্তি উৎপাদনের সময়ে অক্সিজেন পৌঁছে দিতে হয়। শরীরের চাহিদামতো শক্তি উৎপাদনের জন্য প্রয়োজনীয় রক্ত পাঠানোর নির্দেশ হৃৎপিণ্ডে আর ফুসফুসে পৌঁছে যায়। শারীরিক শ্রমের সময় পেশিতে বেশি শক্তি উৎপাদনের প্রয়োজনে হৃৎপিণ্ড আর ফুসফুস দ্রুত লয়ে কাজ করে অক্সিজেন সরবরাহের বন্দোবস্ত করে থাকে। দৌড়নোর সময়ে নাড়ির গতি তীব্র থেকে তীব্রতর হয়। একসময় হৃৎপিণ্ডের কর্মক্ষমতা শেষ সীমায় পৌঁছে যায়। আমরা সেই সীমায় শ্বাসকষ্ট অনুভব করি, বুকের মাঝে উচ্চ মাত্রায় হৃদস্পন্দন টের পাই, বুক ধড়ফড় করতে

থাকে। সেই অবস্থায় বা তার চেয়ে কিছুটা কম মাত্রায় আমরা শারীরিক শ্রম চালিয়ে যেতে পারি আরও কিছুক্ষণ। ম্যারাথন দৌড়ে অংশগ্রহণকারীরা সেটাই করে। সেই সময় হৃৎপিণ্ডের পাঠানো বেশি পরিমাণের অক্সিজেনসমৃদ্ধ রক্তও যথেষ্ট হয় না। তখন ডাক পড়ে অক্সিজেনবিহীন গ্লুকোজ দহনের বা অ্যানঅ্যারোবিক গ্লাইকোলিসিস (anerobic glycolysis) প্রক্রিয়ার। এই প্রক্রিয়ায় অক্সিজেনের পূর্ণ সদ্ব্যবহারের পরেও, বিনা অক্সিজেনেও কিছুটা গ্লুকোজ পোড়ায়, আরও কিছুটা শক্তি উৎপাদনের জন্য। এই প্রক্রিয়ায় গ্লুকোজ থেকে অপেক্ষাকৃত কম শক্তি মেলে। অক্সিজেনবিহীন গ্লুকোজ দহনের সময় আধপোড়া গ্লুকোজ ল্যাক্টিক অ্যাসিডে পরিণত হয়, যেটা পরে বিশ্রামরত অবস্থায় অক্সিজেনের জোগান পেলে বকেয়া শক্তি উৎপাদন করে ও ল্যাক্টিক অ্যাসিড থেকে কার্বন ডাই-অক্সাইড তৈরি হয়ে নিঃশ্বাসের সঙ্গে বেরিয়ে যায়। তীব্রমাত্রায় শারীরিক শ্রমের পরে ল্যাক্টিক অ্যাসিড বেশ কিছুক্ষণ পায়ের পেশিতে থেকে যায়। যার জন্য পেশিতে অল্প ব্যথা অনুভূত হয় বটে, তবে এই ল্যাক্টিক অ্যাসিডই ব্যায়ামের সময় একটা গুরুত্বপূর্ণ কাজ করে। এর প্রভাবে পায়ের পেশির রক্তনালী প্রসারিত থাকে ও হৃৎপিণ্ডের পাঠানো রক্তের জোগানের বেশিটা পেশিতে সঞ্চালিত হয়। হৃৎপিণ্ডের পাম্প করা রক্ত সরু রক্তনালীতে যতটা যায়, মোটা নালীতে তার চেয়ে বেশি প্রবাহিত হয়, কারণ সেখানে রক্তপ্রবাহে বাধা কম। ট্রাফিক পুলিশ যেমন 'ভিআইপি'দের চলাচলের রাস্তা থেকে দখলদার হকারদের হটিয়ে রাস্তা চওড়া করে দেয়, ল্যাক্টিক অ্যাসিড পায়ের পেশিতে ঠিক তেমনটাই করে। অন্যদিকে, সেরিব্রাল অটো-রেগুলেটরি সিস্টেম মস্তিষ্কের রক্তধারা অক্ষুণ্ণ রাখার জন্য অপেক্ষাকৃত কম গুরুত্বের রক্তনালী সঙ্কুচিত করে রাখে। আবার রাস্তার যাননিয়ন্ত্রণের তুলনা টানি। কম গুরুত্বের রাস্তায় জিগজ্যাগ করে 'রোড ব্লকের রেলিং' খাড়া করে রাখে। যে কথা দিয়ে শুরু করেছিলাম, যখন ছ কিলোমিটার হনহনিয়ে হেঁটে আসছিলাম, তখন পায়ের পেশিতে রক্তের প্রয়োজন ছিল সবচেয়ে বেশি। তবে সেটা মস্তিষ্কের কোটায় কাটছাঁট না করেই। বরং হৃৎপিণ্ড ও ফুসফুস বাড়তি খাটনি খেটে মস্তিষ্ককে তার ভাগ দিয়ে পায়ের পেশিতে বাড়তি শক্তির জ্বালানি হিসাবে রক্তে দ্রবীভূত গ্লুকোজ ও অক্সিজেন পৌঁছে দেয়। হাঁটার সময়ে হৃৎপিণ্ড দ্রুত ও জোরে জোরে স্পন্দিত হয় যার জেরে আমাদের বুক ধড়ফড় করতে থাকে আর ফুসফুসের বাড়তি খাটুনির জেরে শ্বাসকষ্ট হয়। হৃৎপিণ্ড ও ফুসফুসকে দ্রুত ও জোরে জোরে কাজ করার প্রয়োজনীয় নির্দেশ হাঁটা বা দৌড়ানোর প্রক্রিয়াই দিয়ে থাকে। তবে যেই আমরা হাঁটা বা দৌড়নো থামিয়ে দিই, সঙ্গে সঙ্গে হৃৎপিণ্ড আর ফুসফুস তার বিশ্রামরত অবস্থার ধীর লয়ে কাজের ছন্দে ফিরে যায়। কিন্তু পায়ের পেশিতে তখনও জমে থাকে অক্সিজেনবিহীন প্রক্রিয়ার গ্লুকোজ দহনে (অ্যানঅ্যারোবিক গ্লাইকোলিসিসে) উৎপন্ন ল্যাক্টিক অ্যাসিড। সেটার প্রভাবে রক্তনালী বেশ কিছুক্ষণ প্রসারিত থেকে যায়। যার দরুন পায়ের পেশিতে বেশ কিছুক্ষণ বেশি রক্ত প্রবাহিত হতে থাকে। কিন্তু দৌড়নোর সময়ের তীব্র মাত্রার হৃৎপিণ্ডের কাজটা শারীরিক শ্রমের মাত্রা কমে বিশ্রামরত অবস্থায় পৌঁছনোর পরে সবার আগে কমতে থাকে। এদিকে পায়ের পেশিতে তখনও জমে-থাকা ল্যাক্টিক অ্যাসিড মস্তিষ্কের কোটার রক্ত পায়ে পাঠিয়ে দিচ্ছে। ফলে মস্তিষ্কে রক্তের জোগানে ঘাটতি পড়ে, যদি সেরিব্রাল অটো-রেগুলেটরি সিস্টেম পুরোটা সামাল দিতে না পারে। এটা মনে রাখা দরকার, সেরিব্রাল অটো-রেগুলেটরি সিস্টেমেরও একটা সীমাবদ্ধতা আছে। 'শরীরের' বয়স বাড়ার সঙ্গে সঙ্গে এর দক্ষতাও কমতে থাকে। লক্ষণীয়, কেবল বয়স না বলে 'শরীরের' বয়স বলা হল। শরীরের বয়স কেবল জন্মতারিখ দিয়ে সরল পাটীগণিতের অঙ্কের ফল নয়। নিয়মিত শরীরচর্চার ফলে শরীরের বয়সকে অনেকটাই কমিয়ে রাখা সম্ভব।

প্রশ্ন উঠতেই পারে, হনহনিয়ে হেঁটে আসার পরে আমার পা নাড়ানোর সঙ্গে সম্ভাব্য জ্ঞান হারানো আটকানোর সমীকরণটা কী? ঐ সময় বা অ্যাথলিট দৌড় শেষ করার পরে খানিকক্ষণ আস্তে দৌড়নোর সময়ই বা তার সম্ভাব্য মাথা ঝিম ঝিম করা বা মাথা ঘুরে পড়ে যাওয়া কী করে আটকানো যাচ্ছে? তীব্র পরিশ্রম করার পরে হঠাৎ দাঁড়িয়ে পড়লে হৃৎপিণ্ড তখনও মোটা হয়ে থাকা পায়ের ধমনীকে পাত্তা দেয় না। একটু তাড়াতাড়িই হৃৎপিণ্ডের রক্ত পাম্প করার কাজে ঢিলে দেয়। হৃৎপিণ্ডের স্পন্দনের হার সেই মুহূর্তের শারীরিক শ্রমের মাত্রার সঙ্গে নির্ভুলভাবে সঙ্গত দেয়। জোরকদমে হাঁটার পরে পা নাড়াতে থাকলে, ব্যাঙ্কের লাইনে দাঁড়িয়ে থাকার সময় পা নাড়াতে থাকলে, দৌড়বাজ দৌড় শেষ করার পরে কিছুক্ষণ আস্তে দৌড়লে, মানে সইয়ে সইয়ে থামলে হৃৎপিণ্ড বাধ্য হয় আরও কিছুক্ষণ বেশি হারে রক্ত পাম্প করতে। ফলে পায়ের পেশির মোটা হয়ে থাকা রক্তনালীর রক্তের প্রয়োজন মিটিয়েও মস্তিষ্কে উপযুক্ত পরিমাণে রক্ত পাঠাতে পারে। আমরা জ্ঞান হারাই না।

স্বাভাবিক অবস্থায় গড় রক্তের চাপের সীমা (মিন ব্লাড প্রেশার) ৬০ থেকে ১৫০ এর মধ্যে থাকলে, অর্থাৎ আমাদের মতো

জোরকদমে হাঁটার পরে পা নাড়াতে থাকলে, ব্যাঙ্কের লাইনে দাঁড়িয়ে থাকার সময় পা নাড়াতে থাকলে, দৌড়বাজ দৌড় শেষ করার পরে কিছুক্ষণ আস্তে দৌড়লে, মানে সইয়ে সইয়ে থামলে হৃৎপিণ্ড বাধ্য হয় আরও কিছুক্ষণ বেশি হারে রক্ত পাম্প করতে। ফলে পায়ের পেশির মোটা হয়ে থাকা রক্তনালীর রক্তের প্রয়োজন মিটিয়েও মস্তিষ্কে উপযুক্ত পরিমাণে রক্ত পাঠাতে পারে। আমরা জ্ঞান হারাই না।

আমজনতার, যাঁরা কিনা এইসব পড়ার ফুরসত পাই বা পড়ার মতো অবস্থায় থাকি, তাঁদের ক্ষেত্রেই এই স্বয়ংক্রিয় অটো–রেগুলেটরি সিস্টেমটা কাজ করে। সেই কাজের জেরে আমাদের মস্তিষ্কে বহমান রক্তের স্রোত অক্ষুণ্ণ থাকে। সমস্যা হয় শরীরের বয়স বাড়লে। তখন যেমন মস্তিষ্কের 'ভিআইপি' স্ট্যাটাসের অটো–রেগুলেটরি সিস্টেমটা দুর্বল হয়ে যায়, আবার আমাদের অবচেতনে সক্রিয়, বিবর্তনের জেরে প্রাপ্ত, মানুষের দুপায়ে খাড়া থাকার জন্য প্রয়োজনীয় পায়ের পেশির প্রতিবর্ত ক্রিয়াগুলো (reflex action) ভোঁতা হয়ে যায়। একদিকে মস্তিষ্কে রক্ত সরবরাহে ঘাটতি আর অন্যদিকে নিজেকে খাড়া রাখার প্রয়োজনীয় আনুষঙ্গিক সাহায্যের অভাব, এই দুই কারণে মানুষটির দাঁড়িয়ে থাকা অসম্ভব হয়ে যায়। তার ওপরে চোখে কম দেখলে উপরি ঝামেলা। আলো–আঁধারিতে সুস্থ মানুষও হোঁচট খায়। চাকরি থেকে অবসর নেওয়া মানুষটির পড়ে থাকা কয়েকটি বিলাসিতার মধ্যে সকালে মাছের বাজারে যাওয়ার বিলাসিতাটা থেকেই যায়। মাছ কেনার বা কেবল মাছের বাজারে ঘুরে বেড়ানোর অবসরটা থাকে বলে অনেকের কাছে সকালটা জোলো ঠেকে না। সেই মানুষটি যখন কালেভদ্রে মাছ কিনছেন, তখনই ঘটতে পারে দুর্ঘটনা। মাছের বাজারে বসে–থাকা মানুষটি যেই না দরদাম করে উবু হয়ে বসে মাছের চোখ উল্টে, পেট টিপে পছন্দ করে উঠে দাড়ালেন, মাথাটা কেমন ঘুরে গেল, পা টলে গেল, চোখের সামনের পৃথিবী ঝাপসা হয়ে গেল। চারিদিকে একটা হট্টগোল শুনে... আর মনে পড়ে না। সম্বিত ফিরল মিনিটখানেক পরে। মাছের দোকানের পাশে একটা বেঞ্চে চোখ ছানাবড়া করে নিজেকে দেখলেন। চেনা–অচেনা সবাই বেশ যত্নআত্তি করছে। কষ্টের চেয়ে বিড়ম্বনাই বেশি। নিজে সমর্থ হলেও সবাই মিলে একটা রিক্সা ডেকে তাতে চড়িয়ে দিলেন। তারপর ডাক্তার দেখানো, হাজারো পরীক্ষা চলতে থাকল। এক ধাক্কায় মনের বয়সটা বেশ খানিকটা এগিয়ে গেল।

ভেসো ভেগাল অ্যাটাক, চলতি ভাষায় মামুলি ক্ষণিকের জন্য অজ্ঞান হওয়া বলে প্রথমের দিকে ততটা পাত্তা পায় না। ঘন ঘন হতে থাকলে তখন চিকিৎসকের স্মরণাপন্ন হতেই হয়। এমন ক্ষেত্রে মৃগী রোগ, হার্ট ব্লক, হার্টের ভ্যাল্‌ব সরু হয়ে যাওয়ার রোগ (অ্যাওর্টিক বা পালমোনারি স্টেনোসিস), হাইপারট্রপিক কার্ডিওমায়োপ্যাথি, পালমোনারি থ্রম্বোএম্বোলিজম ইত্যাদি হাতেগোনা অল্পসংখ্যক কয়েকটা রোগ নেই, সেটা বুঝে নেবার দায় চিকিৎসকের। সেই বিশ্লেষণের জন্য অজ্ঞান হওয়ার পুঙ্খানুপুঙ্খ বিবরণ যথেষ্ট সাহায্য করে। প্রয়োজনমতো কয়েকটি পরীক্ষানিরীক্ষা করে নেওয়ার পরে পড়ে থাকে বিশাল সংখ্যক ভেসো ভেগাল অ্যাটাকের রুগী।

ভেসো কথাটা এসেছে ভেসেলস অর্থাৎ রক্তনালী, ভেগাস একটি 'পারাসিম্প্যাথিক' গোত্রের স্নায়ু, যেটি পাকস্থলী ও অন্ত্রের সংবেদন মস্তিষ্কে বয়ে নিয়ে যায়। উদাহরণ স্বরূপ বলা যায়, বুকের নিচে জোরে ঘুসি মারলে এই স্নায়ুটি উত্তেজিত হয় আর তার প্রভাবে হৃদ্‌স্পন্দনের হার ও রক্ত চাপ কমে যায়, আঘাতপ্রাপ্ত মানুষটি ক্ষণিকের জন্য অজ্ঞানও হয়ে যেতে পারেন। ক্ষণিকের অজ্ঞানের রোগের প্রায় ৭০ শতাংশই ভেসো ভেগাল অ্যাটাক গোত্রের। পরে বিস্তর অনুসন্ধান করেও এঁদের হৃদ্‌রোগের অস্তিত্ব খুঁজে পাওয়া যায় না। অজ্ঞান হওয়ার সময় হৃদ্‌স্পন্দনের হার ও রক্ত চাপ অস্বাভাবিকভাবে কমে যায় বলে অনুমান করা হয় ভেগাস বা অন্য কোন পারাসিম্প্যাথেটিক গোত্রের স্নায়ুর উত্তেজনা অজ্ঞানের কারণ। বিশেষত খেলার মাঠে বা দৌড়নোর ট্রাকে ক্রীড়াবিদের অজ্ঞান হওয়ার মুখ্য কারণ ভেসো ভেগাল অ্যাটাক।

মাঝরাতে ঘুমের ঘোরে টয়লেটে দাঁড়িয়ে প্রস্রাব করার সময় অথবা সকালবেলা ঘুম থেকে উঠে কমোডে বসে কাজ সেরে উঠে দাঁড়ানোর সময় মাথাটা ঘুরে যায়... তারপর ধুম করে শব্দ,

পতন ও ক্ষণিকের জন্য মূর্ছা। শব্দ শুনে সবাই ধরাধরি করে বিছানায় নিয়ে আসার সময়ই জ্ঞান ফিরে আসে। এটাও ওই ভেসো ভেগাল অ্যাটাক। সবার ক্ষেত্রে অজ্ঞান হওয়ার কারণ এক নয়। সেটা ভেসো ভেগাল অ্যাটাকের জন্য, এটা জানা গেলে সাবধান হয়ে যাওয়াটাই এর চিকিৎসা। এই রোগের কোনো ওষুধ হয় না।

অজ্ঞান হওয়ার কারণ অনুসন্ধানে আমআদমির মুখ্য ভূমিকা নেই। এই রহস্য অনুসন্ধানের কাণ্ডারি ডাক্তার। সাধারণের কাজ হল ডাক্তারের কাছে যাওয়ার সময়ে একজন প্রত্যক্ষদর্শীকে সঙ্গে নিয়ে যাওয়া, যদি সেটা সম্ভব হয়। অজ্ঞান হওয়ার কারণ অনুসন্ধানে চিকিৎসকের মুখ্য হাতিয়ার ঘটনার পুঙ্খানুপুঙ্খ বিবরণ, যেটা রুগীর পক্ষে জানা সম্ভব নয়। ডাক্তারি পরীক্ষা-নিরীক্ষার তালিকাটি বেশ লম্বা, সেটা খানিকটা সাহায্য করে। তবে যে রোগের নির্ণয়ের পরীক্ষার তালিকাটা দীর্ঘ, ডাক্তারি পরীক্ষায় সেই রোগের টিকিটা ধরে ফেলার সম্ভাবনা ততটাই ক্ষীণ। হৃদ্‌রোগের কারণ অনুসন্ধানের জন্য আছে হল্টার স্টাডি, ইলেক্ট্রোফিজিওলজি পরীক্ষা, ইভেন্ট রেকর্ডিং, সাইনাস নোড রিকভারি টাইম...। এতেও বুঝিবা সব হার্ট ব্লকের রোগ ধরা পড়ে না। মৃগীরোগ থাকলেও ইলেক্ট্রোএনসেফালোগ্রাম (ইইজি), মাথার সিটি স্ক্যান বা ম্যাগনেটিক রেজোনেন্স ইমেজিং (এমআরআই) ৩০ শতাংশের কম ক্ষেত্রে সেই রোগের আভাস দেয়। এই সব রোগগুলো রোগের বিবরণ (প্রত্যক্ষদর্শীর দেওয়া বিবরণ) থেকেই অনুমান করে চিকিৎসা করতে হয়। সবশেষে নিবেদন, বয়স বাড়বেই, নিয়মিত শরীরচর্চা করে শরীরের বয়স কমিয়ে রাখতে পারলে ভেসো ভেগাল অ্যাটাকের কারণে অজ্ঞান হয়ে যাওয়ার বিরুদ্ধে 'যৌবনের সুরক্ষা' ধরে রাখা সম্ভব, অটো-রেগুলেটরি সিস্টেম সবল রাখা সম্ভব। সম্ভব শৈশবে আছাড় খেতে খেতে শেখা খাড়া থাকার প্রতিবর্ত ক্রিয়া-কৌশল ধরে রাখা। আসলে ভেসো-ভেগাল অ্যাটাকের চিকিৎসার জন্য কোনো ওষুধ-বিষুধ নেই। এই রোগে অজ্ঞান হলে সেটা নিশ্চিত করারও কোনো ডাক্তারি পরীক্ষা নেই। এই রোগনির্ণয়ে জন্য 'হেড টিল্ট আপ টেস্ট' নামান্তরে 'আপরাইট টিল্ট টেবিল টেস্ট' (Up-right tilt table test) নামে একটা ঝকমারি পরীক্ষা আছে বটে, তবে প্রথা হোল, হার্ট ব্লক আর মৃগী নেই, এই তথ্যটাই যথেষ্ট। ভেসো-ভেগাল অ্যাটাক রোগনির্ণয় একটি আনুমানিক রোগ নির্ণয় প্রক্রিয়া। এর একমাত্র চিকিৎসা, রোগীর শারীরিক ক্ষমতা অনুযায়ী ক্রমবর্ধমান মাত্রায় শরীরচর্চা করা আর সেটা না করা গেলে বার্ধক্য মেনে নিয়ে হাতে লাঠি নিয়ে নিয়ন্ত্রিত চলাফেরায় নিজেকে তৃপ্ত রাখা।

পুনশ্চঃ যাঁরা অজ্ঞান হওয়া মানুষের পাশে ঘটনাচক্রে উপস্থিত থাকেন, চিকিৎসা পরিষেবা উপলব্ধ হবার আগের সময়টুকুতে তাঁরা কিছু সাহায্য করতে চাইলে সেই মুহূর্তে এইগুলো করুন:

১) অজ্ঞান হওয়া মানুষটিকে তাড়াতাড়ি এমনভাবে শুইয়ে দিন, যাতে তাঁর মাথাটা উঁচু না থাকে। মাথার নিচে বালিশ দেওয়া বাঞ্ছনীয় নয়। মাথা বুকের সঙ্গে অনুভূমিক বা নিচের দিকে থাকলে মাধ্যাকর্ষণের সুবিধা নিয়ে মস্তিষ্কে বেশি রক্ত যেতে পারবে। শোবার মতো পরিষ্কার জায়গা নয়, এই অজুহাতে কাছাকাছি বেঞ্চি বা বিছানায় নিয়ে যাওয়া চলবে না। রাস্তায়, মাছের বাজারে বা টয়লেটে শুইয়ে দিলে বা শুয়ে থাকলে কোনো শারীরিক ক্ষতি হবে না। চিত করে নয়, উপুড় করে মাথাটা একদিকে পাশ ফিরিয়ে শোয়াতে পারলে ভালো। কাছাকাছি কোনো ধারালো বস্তু বা আগুন থাকলে সেইগুলো সরিয়ে দিন। মুখের মধ্যে চটি বা জুতো ঠেসে ধরার দরকার নেই। শক্ত প্লাস্টিকের কোনো পাইপ বা চামচ মুখের মধ্যে রাখলেও রাখতে পারেন। এতে অসাবধানে রুগীর নিজের জিভ কামড়ে ফেলার ভয় থাকে না। মুখ দিয়ে লালা সহজে বেরিয়ে আসে, শ্বাসনালীতে ঢুকে পড়ে না। তবে দাঁত চেপে বন্ধ হয়ে থাকলে, তা জোর করে খোলার চেষ্টা না করাই ভাল। অনেকে তা করতে গিয়ে দাঁত ভেঙে রক্তারক্তি কাণ্ডও ঘটিয়ে ফেলেন।

২) অজ্ঞান হওয়া ব্যক্তিটির অজ্ঞান অবস্থায় থাকার সময়টা সঠিকভাবে হিসেব করে নেবেন। অজ্ঞান অবস্থায় চারপাশের মানুষের সাহায্য করার কর্মকাণ্ডে অজ্ঞান অবস্থায় কোনো কথার উত্তর দেওয়া বা শারীরিক ভাষায় কিছু প্রকাশ করা সম্ভব নয়। যেমন সম্ভব নয় পাশ ফেরানোর সময় নিজেকে সাহায্য করাও। এটা খেয়াল রেখে ব্যক্তিটি সত্যিই অজ্ঞান কিনা সেটা সমঝে নেওয়া যাবে। লক্ষ্য করবেন, অজ্ঞান অবস্থায় মানুষটির অঙ্গপ্রত্যঙ্গ শক্ত হয়ে আছে, না শিথিল আছে। মানুষটিকে সঠিকভাবে শুয়ে থাকতে সাহায্য করার সময় এটা খেয়াল করা যায়। নাড়ীর গতি বা পাল্‌স রেট মাপতে জানলে সেটা মেপে নিন। নাড়ীর গতি ক্ষীণ হলে জ্ঞান হারানো ব্যক্তিটির বুকে কান রেখে প্রতি মিনিটে হৃদ্‌স্পন্দনের হার গোনা সম্ভব। জ্ঞান হারানো অবস্থায় মানুষটির হাত-পা কাঁপছে কিনা, কাঁপলে কত দ্রুত কাঁপছে, হাত দিয়ে চেপে ধরলে সহজেই সেই কম্পন থামানো যাচ্ছে কিনা, পরনের কাপড়ে অসাড়ে মলমূত্র ত্যাগ হয়ে গেল কিনা, এই তথ্যগুলো খেয়াল করে নিন। এই তথ্যগুলো চিকিৎসককে জ্ঞান হারানোর কারণ নির্ণয়ে সাহায্য করবে।

উমা

রাজা রামমোহন রায়ের প্রাসঙ্গিকতা

জয়ন্ত ভি. নারলিকার

অনুবাদ: প্রদীপ্ত গুপ্তরায়

রাজা রামমোহন রায় লাইব্রেরি ফাউন্ডেশন আয়োজিত এবারের রাজা রামমোহন রায় স্মারক বক্তৃতায় যখন বলার অনুরোধ করা হল, তা আমার কাছে বিস্ময়কর বলেই মনে হল। মর্যাদাপূর্ণ এক সংস্থার কাছ থেকে পাওয়া এক মর্যাদাপূর্ণ কাজ। আমি কৃতজ্ঞতার সঙ্গেই গ্রহণ করলাম। আগের বক্তাদের কিছু বক্তৃতা পড়ার সৌভাগ্য আমার হয়েছে। তাতে বুঝতে পারছি, তাঁদের জ্ঞানের গভীরতার ধারেকাছেও আমি নেই। যাইহোক, এইসব বক্তৃতাগুলো থেকে রাজা রামমোহন রায়ের অসাধারণ ব্যক্তিত্বের কিছু ঝলক দেখার সৌভাগ্য হয়েছে। তাঁর সম্বন্ধে আমার জ্ঞান বলতে স্কুলের বইয়ে থাকা অপ্রতুল কিছু তথ্য। যেমন, দু শতক আগে তাঁর সতীদাহের বিরুদ্ধে প্রচার এবং সমাজসংস্কার। ব্যস, এইটুকুই।

এই লাইব্রেরি ফাউন্ডেশন তার ছোট্ট অবস্থা থেকে এখন ভারতের সব জায়গায় পরিচিত। ১৯৭১ সালে ছিল ৩৭১টি গ্রন্থাগার, সেখানে ১৯৯৭-এ ৩০ হাজারে পৌঁছেছে! এটা বিস্ময়কর। আমি ফাউন্ডেশনকে এর জন্য অভিনন্দন জানাই। রামমোহন রায়, সেই সময়কালেও, সবসময়ই নতুন নতুন অগ্রগতি এবং বিভিন্ন প্রগতিশীল ধারণা সম্পর্কে সচেতন ছিলেন এবং সেগুলো সমাজের উন্নতির কাজে কীভাবে প্রয়োগ করা যায়, তার চেষ্টা করতেন। তিনি যদি এইসময় থাকতেন, আমি নিশ্চিত, তিনি লাইব্রেরি-ব্যবস্থাকে তথ্যপ্রযুক্তি ব্যবহারের সাহায্যে আধুনিকীকরণের পক্ষেই ওকালতি করতেন।

১

কালিদাস 'রঘুবংশম'-এ লিখেছিলেন, 'অথয়া কৃতভাগদ্বারে মার্গেস্মিন পূর্বসুরিভিঃ মানাউ বজ্রসমুতকীর্ণে সূত্রাস্যেস্থি মে গতিঃ' (প্রথম অধ্যায়, ৪র্থ সুক্ত)। অর্থাৎ, 'আগের পণ্ডিতদের কাজের ফলে আমার এই পথে এগোন সহজ হয়েছে, যেমনভাবে একটা সুতো কঠিন দামি পাথরের মধ্যে তৈরি গর্ত দিয়ে স্বচ্ছন্দে যায়।' এই কথা স্বভাবসিদ্ধ নম্রতার সঙ্গে বলে মহাকবি এক শ্রেষ্ঠ অবদান রেখে গেছেন। আমার সে রকম কোনো আশা নেই।

কল্পবিজ্ঞানের ভক্ত হয়ে এবং এইচ জি ওয়েলসের চমকপ্রদ গল্প 'দ্য টাইম মেশিন'-এর সূত্র ধরে একটা অভিনব উপায় ভাবছিলাম। যদি রাজা টাইম মেশিন ব্যবহার করতে পারতেন এবং তাঁকে বর্তমান শতাব্দীতে আনা যেত, তাহলে আজকের ভারতকে তিনি কেমন দেখতেন? তিনি যে সংস্কারগুলোর সঙ্গে জড়িত ছিলেন, তার প্রয়োগ দেখে তিনি কি সুখী হতেন? নাকি দুশো বছর আগে তিনি সংস্কারের জন্য যে ধর্মযুদ্ধ লড়েছিলেন, দেশের প্রয়োজনে কি আবার সেইরকম লড়াই করতে হবে- সেরকম ভাবতেন?

২

এই বক্তৃতার পশ্চাৎপট তৈরির জন্য, আমি রাজা রামমোহন রায়ের জীবনী এবং সময়কাল একটু মনে করাই। ১৭৭২ খ্রিষ্টাব্দের ২২ মে বাংলার রাধানগরে এক বর্ধিষ্ণু ব্রাহ্মণ পরিবারে তাঁর জন্ম। কাজেই, তিনি ব্রিটিশ ইস্ট ইন্ডিয়া কোম্পানি-শাসিত অঞ্চলে এক রাজসিক জীবন সহজেই কাটাতে পারতেন। (পলাশীর যুদ্ধ তাঁর জন্মের পনের বছর আগেই হয়ে গেছে।) কিন্তু সেরকমটি ঘটল না। বাংলার বাইরে অনেক জায়গায় তিনি ঘুরলেন; বাংলা, হিন্দুস্তানি, ইংরাজির পাশাপাশি শিখলেন সংস্কৃত, ফারসি, আরবি, হিব্রু এবং গ্রিক। প্রাচ্য এবং পাশ্চাত্ত্য সংস্কৃতি ও সাহিত্য নিয়ে পড়াশুনো করে আত্মস্থ করলেন। আর সেই জ্ঞান থেকে ভারতের রাজনৈতিক, সামাজিক এবং অর্থনৈতিক পরিবর্তনে নিজের প্রতিক্রিয়া জানানোর চেষ্টা করলেন।

এই প্রতিক্রিয়ার কিছুটা ছিল, হিন্দুদের কয়েকটা দীর্ঘলালিত বিশ্বাস এবং সংস্কার— যার মধ্যে অবশ্যই জাতিভেদ প্রথা এবং 'সতী'দাহ প্রথা— এসবের বিরুদ্ধে নিরলস সমালোচনা। তিনি নানাভাবে সামাজিক প্রথা ভেঙেছেন, যার মধ্যে বাংলা ভাষায় উপনিষদের অনুবাদ আছে, আবার পাশাপাশি বিদেশভ্রমণও আছে।

আগেরটি সংস্কৃত জানেন না এমন সব মানুষদের সামাজিক

প্রথা এবং কুসংস্কারহীন প্রকৃত জ্ঞান জানানোর তাগিদে। আর পরেরটি হয়েছে পশ্চিমী সংস্কৃতি এবং নতুন-আগত জ্ঞানের আকর্ষণে।

ইউরোপে, সে সময়ে, নিউটনোত্তর যুগ শুরু হয়ে শিল্পবিপ্লব শুরু হচ্ছে। রামমোহন বুঝেছিলেন, পশ্চিম থেকে আগত জ্ঞানকে আমরা উপেক্ষা করতে পারব না বা সেই সামর্থ্যও নেই। সেই কারণে তিনি প্রথাগত সংস্কৃত-নির্ভর শিক্ষার (যা যুগ যুগ ধরে অপরিবর্তনীয়) পরিবর্তে ইংরাজি শিক্ষার স্কুলকে অগ্রাধিকার দিয়েছিলেন। তাঁর সময়েই পৃথিবী এমন এক যুগের মধ্যে দিয়ে গেছে যেখানে পূর্ব এবং পশ্চিমের মধ্যে ব্যবধান খুব দ্রুত বেড়ে যাচ্ছে, সেটা তিনি তাঁর অসাধারণ দূরদৃষ্টি দিয়ে দেখতে পেয়েছিলেন।

এই প্রসঙ্গে, এই উপমহাদেশের নোবেলজয়ী পদার্থবিদ আব্দুস সালামের একটা মন্তব্য মনে পড়ে যাচ্ছে। সালাম বলেছিলেন, তাজমহল এবং সেন্ট পলস্ গির্জা— একটা পূর্বের আর অন্যটা পশ্চিমের— দুটোই স্থাপত্যের উৎকর্ষের প্রতীক। দুটোই মোটামুটি একই সময়কালে তৈরি এবং এই ক্ষেত্রে দুটো সংস্কৃতিই সেই সময়ে এক তুলনাযোগ্য উচ্চতায় পৌঁছেছিল। সময়ের সঙ্গে সঙ্গে ইংল্যান্ডে নিউটন এলেন এবং বিজ্ঞানের অগ্রগতির এক দৌড় শুরু হল।

সপ্তদশ এবং অষ্টাদশ শতকে পাশ্চাত্ত্যে কেবলমাত্র যে রাজন্যদের পৃষ্ঠপোষকতায় বিজ্ঞান এগিয়েছিল তা নয়, কয়েকজন বনেদি ধনীব্যক্তিও বিজ্ঞানকে এগিয়ে নিতে সাহায্য করেছিলেন। রয়্যাল সোসাইটি, ফ্রেঞ্চ অ্যাকাডেমি এবং এই ধরনের কিছু সংস্থা যৌথভাবে বিজ্ঞানের উন্নতিতে সহায়তা করেছিল। ভারতে সেসময়ে কোনো উল্লেখযোগ্য উন্নতি হয়নি। শিল্পের জন্য পৃষ্ঠপোষক অনেকে ছিলেন কিন্তু বিজ্ঞানের জন্য নয়। বিজ্ঞানের এই সংস্কৃতিই ভারতবর্ষ এবং ইউরোপের উন্নতির ক্ষেত্রে একটা তফাত গড়ে দিল; এই তফাতটাই রামমোহন লক্ষ্য করেছিলেন এবং তার মর্ম উপলব্ধি করেছিলেন।

এই কারণে, ব্রিটিশরা যখন কলকাতায় সংস্কৃত কলেজ খুলতে চাইছিল, রামমোহন এই প্রস্তাবের তীব্রভাবে প্রতিবাদ করেছিলেন এবং বিজ্ঞান, ইতিহাস, ভূগোল, অর্থনীতি ইত্যাদি নিয়ে তৈরি পশ্চিমী পাঠ্যক্রমের পক্ষেই ওকালতি করেছিলেন। তিনি এটা বুঝেছিলেন, পশ্চিমের দ্রুত বেড়ে ওঠা অগ্রগতিকে ধরতে গেলে আমাদের ছাত্রদের আধুনিক বিদ্যায় জ্ঞানলাভ করাটা অনেকবেশি জরুরি। তার মানে কিন্তু এরকম নয় যে, তিনি পাশ্চাত্ত্যের অন্ধ সমর্থক এবং প্রাচ্যকে হেয় করাই তাঁর কাজ।

অনেক ক্ষেত্রেই তিনি হিন্দুধর্মকে খ্রিষ্টান মিশনারির অকারণ আক্রমণের হাত থেকে দৃঢ়তার সঙ্গে রক্ষা করেছেন। তিনি হিব্রু ও গ্রিক ভাষা শিখেছিলেন, যাতে মিশনারিদের মুদ্রিত রচনা পড়তে পারেন এবং কর্তৃত্ব ও যুক্তির সঙ্গে তাদের বিরুদ্ধাচরণ করতে পারেন। তিনি ভারতীয় দর্শনের উদার পরম্পরাকে গভীরভাবে উপলব্ধি করেছিলেন এবং এই প্রোজ্জ্বল ধারণা প্রচার করার উদ্দেশ্যে তিনি ব্রাহ্মসমাজ প্রতিষ্ঠা করেছিলেন। দিল্লির নামেমাত্র সম্রাটের প্রতিনিধি হয়ে তিনি ১৮৩০ সালে যখন ইংল্যান্ড গেলেন, বক্তৃতা ও আলোচনার মাধ্যমে ভারত যে একটা জ্ঞানের দেশ, এই ধারণা তুলে ধরতে পেরেছিলেন। ২৭ সেপ্টেম্বর ১৮৩৩-এ জ্বরের কারণে তাঁর অসময়ে মৃত্যুর ফলে ভারত আধুনিকতার দিকে এগিয়ে নিয়ে যাওয়ার এক নেতাকে হারাল। এই ঘটনাগুলো এমন এক অসাধারণ মানুষের, যিনি তাঁর সময়ের থেকে অনেক এগিয়ে দেখতে পেয়েছিলেন।

৩

এইরকম কয়েকজন ব্যক্তি সম্পর্কে আমি কিছু সাধারণ মন্তব্য করতে চাই, যাঁদের দূরদৃষ্টি তাঁদের সময় থেকে অনেক এগিয়ে ছিল। স্বপ্নদর্শীরা সামাজিক সংস্কারসাধনের কথা ভাবেন এবং অনেক ধরনের বিরোধিতার মুখোমুখি পড়তে হয়। এই সংস্কারসাধনের বিষয়গত ক্ষেত্রে পক্ষে ও বিপক্ষে অনেকগুলো অংশ আছে, যা এই বিরোধিতার কারণ। সমসাময়িক ধারণা ও বিশ্বাস কিছু কিছু সমস্যার ক্ষেত্রে পরিষ্কারভাবে আলো ফেলতে ব্যর্থ হয়। যুক্তির ঠিক বা ভুল বিচার হয় দশকের পর দশক কোনো ঘটনার ক্ষেত্রে আমরা কীভাবে প্রতিক্রিয়া দিচ্ছি তার ওপর। সামাজিক বিজ্ঞান, বিজ্ঞানীরা বর্তমানে অনুগ্রহ করে যাকে 'নরম বিজ্ঞান' বলেন, জড়িত থাকলে এই প্রতিক্রিয়াগুলো কি কিছুটা ভাল হোত? নিজেকে বস্তুগত বলে দাবি করে, বিজ্ঞান কি তর্কগুলো তুলনায় সহজে সমাধান করতে পারে? এটা হওয়া উচিত, কিন্তু সাধারণভাবে তা হয় না! রাজা রামমোহন রায় সম্পর্কে ফেরত আসার আগে আমি কয়েকটা উদাহরণ দিচ্ছি।

পঞ্চম শতকে ভারতীয় বুদ্ধিজীবীরা গ্রিসে উদ্ভূত ভূকেন্দ্রী তত্ত্বে (জিওসেন্ট্রিক থিয়োরি) বিশ্বাস করতেন। এই তত্ত্ব অনুযায়ী পৃথিবী স্থির এবং গোটা বিশ্বব্রহ্মাণ্ড তার চারপাশে ঘুরছে। কিন্তু বর্তমান বিহারে অবস্থিত কুসুমপুরের জ্যোতির্বিদ আর্যভট্ট অন্যভাবে ভাবলেন। তিনি তাঁর বই 'আর্যভট্টয়া'-তে লিখলেন:

অনুলোমগতিরনৌস্থাঃ পশ্যত্যচলম ভিলোমগম যদ্‌বৎ
অচলনি ভনি তদ্ভত সমপশ্চিমগ্নি লংকয়ম।।

[৪র্থ অধ্যায়, ৯ম সুক্ত]

এই শ্লোকে তিনি, তুলনা করে বলেছেন, একজন মানুষ যখন নৌকো করে যায় সে ডাঙার স্থির বস্তুকে উল্টোদিকে যেতে দেখে, সেইরকমই স্থির তারাগুলি পশ্চিমদিকে যেতে দেখা যায়, কারণ সেগুলো পৃথিবীর গতিশীল তল থেকে দেখি। এখানে আর্যভট্ট, পৃথিবী যে পশ্চিম থেকে পুবে নিজের অক্ষের চারপাশে ঘোরে, যার ফলে তারাদের উল্টোদিকে আপাত গতি হয়, সেটাই নির্দেশ করেছিলেন।

এই উপমাটা যথাযথ এবং পরিষ্কার। তাও আর্যভট্টের মতো একজন সম্মাননীয় শিক্ষক-পণ্ডিতের এই বিবৃতি তাঁর সমসাময়িক, এমনকি পরবর্তী কালের জ্যোতির্বিদেরা উপেক্ষা করে গেলেন! কারণ, এই বিবৃতি সেই সময়কালের সার্বিক বিশ্বাসের সঙ্গে মিলছিল না। দশ শতক পরে, কোপার্নিকাস একই কথা বললেন, সঙ্গে এও বললেন, পৃথিবী সূর্যের চারদিকে ঘুরছে। তাঁর বই প্রচারের জন্য বন্ধ করে দেওয়া হোল। ইতিহাস জানায়, জিওর্দানো ব্রুনো এবং গ্যালিলিও গ্যালিলি কোপার্নিকাসের তত্ত্ব রক্ষা করতে গিয়ে কীভাবে কষ্টভোগ করেছিলেন।

পাছে আপনারা ভাবেন, এই বিংশ শতাব্দী আলাদা এবং আমরা কিছুটা বস্তুবাদী হয়ে গেছি, আপনাদের বলছি, ওয়েগেনারের (Wegener) বিষয়টা দেখুন— যিনি ১৯১৫ খ্রিষ্টাব্দে মহাদেশীয় সঞ্চালনের (কন্টিনেন্টাল ড্রিফ্‌ট) তত্ত্ব দিয়েছিলেন। তত্ত্বটি তৈরি হয়েছিল বিভিন্ন মহাদেশের ভূ-ভর একটার সঙ্গে আরেকটা খাপ খেয়েছে অনেকটা জিগস পাজ্‌লের মতো— এই তথ্যের ওপর ভিত্তি করে। ওয়েগেনার বললেন, ভূত্বকের ওপরের তল ভেঙে যাচ্ছে এবং এই খণ্ডগুলো পরস্পর থেকে দূরে সরে যাচ্ছে। প্লেটগুলোর পারস্পরিক ধাক্কায় বড় পাহাড় শ্রেণী তৈরি হচ্ছে। যেমন, হিমালয় তৈরি হয়েছে ভারত-উপমহাদেশ প্লেটের সঙ্গে এশিয়া প্লেটের ধাক্কায়।

তাঁর সময়ের ভূপদার্থবিদেরা এই তত্ত্বকে ছিঃ ছিঃ করলেন। শুধু তাই নয়, ওয়েগেনার জীবিত অবস্থায় অবহেলা আর উপহাসের পাত্র হয়েছিলেন। তাঁর মৃত্যুর পরে ১৯৫০ সাল নাগাদ এই তত্ত্ব সমর্থন লাভ করতে শুরু করে এবং বর্তমানে এটি একটি প্রতিষ্ঠিত তত্ত্ব।

তাত্ত্বিকদের বিরোধিতার একটা কারণ হতে পারে, মহাদেশীয় সঞ্চালনের কোনো বিশ্বাসযোগ্য ব্যাখ্যা পাওয়া যাচ্ছিল না। প্রকৃতিতে এমন অনেক ঘটনা ঘটেছে, যার কোনো প্রতিষ্ঠিত তত্ত্ব নেই। আমরা কি তাহলে ঘটনার বাস্তবতাকে বাতিল করে দেব, বুঝতে পারছি না বলে? বিজ্ঞানীরা একটা প্রবচন মানেন: 'যে তত্ত্ব তথ্যের সঙ্গে মেলে না তাকে, বিশ্বাস কোরো না।' এটা যুক্তিপূর্ণ বলেই মনে হয়। এখানে এবং আরো অনেক ক্ষেত্রেই আমরা উল্টো চিন্তার মুখোমুখি হই: 'এমন কোনো তথ্য বিশ্বাস কোরো না, যা তত্ত্ব দিয়ে বোঝানো যায় না।' এটা কি যুক্তিপূর্ণ বলে মনে হচ্ছে?

৪

আর্যভট্ট, ব্রুনো, গ্যালেলিও এবং ওয়েগেনারের মতো রামমোহন রায়ের চিন্তা ও দর্শন সমসাময়িক ধারণার সঙ্গে এক ছিল না। অনেক সময়ই বলা হয়, তিনি সময় থেকে অনেক এগিয়ে জন্মেছিলেন।

স্বাভাবিকভাবে এই প্রশ্ন ওঠে, বর্তমান শতকে তাঁর চিন্তাধারা কতটা প্রাসঙ্গিক। যেহেতু তিনি ১৮ ও ১৯ শতকে ছিলেন, বিংশ শতাব্দীতে কি তাঁকে ধরা যাবে? এই মূল প্রশ্নটারই আমি আজ উত্তর দিতে চাই। রামমোহনের চিন্তার সুনির্দিষ্ট দিকগুলো আলোচনা করার আগে তাঁর সময়কালের সঙ্গে বর্তমান শতকের শেষভাগের তফাতগুলো দেখে নিই।

কেউ যদি পর পর দুই শতাব্দীর শেষে মানবজাতির অস্তিত্বের তুলনা করে, তবে দেখতে পাবে, গত শতাব্দীর তুলনায় বর্তমান শতাব্দীতে অনেক পরিবর্তন হয়েছে। মানুষের জীবনশৈলির নাটকীয় পরিবর্তনের জন্য বৈজ্ঞানিক বিপ্লবকে ধন্যবাদ। কল্পবিজ্ঞান লেখক রে ব্র্যাডবেরির একটা মন্তব্য এই প্রসঙ্গে মনে পড়ছে: 'যে সব মানুষের জীবন বিংশ শতাব্দীতে কাটছে, তাদের কাছে কল্পবিজ্ঞান বাস্তবে পরিণত হয়ে গেছে। যাদের শৈশব ১৯২০ নাগাদ কেটেছে, তাদের কাছে জেট ও শব্দোত্তর বিমানযাত্রা, মোবাইল ফোন, চান্দ্র এবং গ্রহান্তরে যাবার মহাকাশযান, কম্পিউটার চালিত স্বয়ংক্রিয়তা, টেলিভিশন, নিউক্লীয় শক্তি, ইলেকট্রনিক মেল এবং ওয়েব-সার্ফিং— এগুলো সবই প্রাথমিকভাবে কল্পবিজ্ঞানেরই অংশ ছিল। কিন্তু তাদের জীবনেই এগুলো বাস্তবে ঘটে গেছে।' কাজেই, রামমোহনের সময়কাল এবং বর্তমানের মধ্যে তফাত অনেকটাই।

এই পরিবর্তনগুলো শুধু যে পাশ্চাত্যেই সীমাবদ্ধ ছিল তা নয়, যদিও পরিবর্তনের হাওয়াটা ওদিক থেকেই এসেছে। রামমোহনের সময়, পশ্চিম থেকে আসা নতুন জ্ঞান ভারত যাতে না হারায় তার জন্য তিনি ব্যগ্র ছিলেন। এই কারণেই তিনি সংস্কৃত-নির্ভর শিক্ষার পরিবর্তে ইংরাজি-বলা স্কুল ও

কলেজের ওপর জোর দিয়েছিলেন। ব্রিটিশ গভর্নর জেনারেল লর্ড আমহার্স্টকে একটা চিঠিতে তিনি লেখেন:

'... সংস্কৃতনির্ভর শিক্ষাব্যবস্থা নির্ধারিতভাবেই দেশকে অন্ধকারের দিকে ঠেলে দেবে, যদি এটাই ইংরেজ আইনপ্রণেতাদের কর্মপন্থা হয়। কিন্তু যেহেতু সরকারের লক্ষ্য দেশীয় জনগণের উন্নতিবিধান করা, একটা উদার ও জ্ঞানদীপ্ত শিক্ষাপদ্ধতি দরকার, যেখানে গণিত, স্বাভাবিক দর্শন, রসায়ন, শারীরবিদ্যা এবং অন্যান্য প্রয়োজনীয় বিজ্ঞান থাকবে।...'

সেই সময়ে, পশ্চিমী শিক্ষার প্রতি সাধারণের প্রতিক্রিয়া ছিল নেতিবাচক। তখন শিক্ষিত সমাজকে পাশ্চাত্ত্য শিক্ষাগ্রহণ করার ব্যাপারে বোঝানোর ব্যাপার ছিল। আর আজকাল আমরা উল্টো ছবি দেখি!

পৃথিবীর সঙ্গে যোগাযোগ রাখতে গেলে ইংরাজিমাধ্যম স্কুল অপরিহার্য, এই ধারণা বর্তমানে সাধারণভাবে গৃহীত। প্রকৃতপক্ষে, শহরাঞ্চলে দেখা যাচ্ছে, ইংরাজির 'আক্রমণে' স্থানীয় ভাষা বিপন্ন বোধ করছে। এই ব্যবস্থা ঠিক কি ঠিক না, তা তর্কসাপেক্ষ। আমি দীর্ঘদিন ধরে যা মনে করে আসছি তা হল, স্কুলস্তরে বিষয়গুলি মুখস্থর চাইতে বোঝার প্রয়োজন বেশি এবং বাচ্চার মাতৃভাষাতে অঙ্ক ও বিজ্ঞান বেশি ভালভাবে শিক্ষা দেওয়া যায়।

কল্পনা করছি, রাজা তাঁর টাইম মেশিনে করে বর্তমানে এলে তাঁর প্রতিক্রিয়া কেমন হতে পারে? তিনি কি এই সাধারণের গ্রহণযোগ্য ভারতের পশ্চিমী ধাঁচের শিক্ষাব্যবস্থাকে অনুমোদন দেবেন? তিনি তাঁর সময়ে এর জন্য যেহেতু প্রবলভাবে ওকালতি করেছিলেন, সেই কারণে হয়ত তিনি অনুমোদন দিতে পারেন। যখন আমরা আর ব্রিটিশ সরকারের অধীন নই, সেই সময়ে ইংরাজি ভাষার এরকম বাড়বাড়ন্ত দেখে তিনি নিশ্চয়ই বিস্মিত হতেন। তাঁর অতিশয় দেশপ্রেমের কারণেই দেশীয় ভাষার বিপন্নতায় তিনি নিশ্চয় আক্ষেপ করতেন। আমি মনে করি, তিনি দেশীয় ভাষা এবং দেশীয় বিভিন্ন সংস্কৃতির জন্য প্রচার চালাতেন। পাশাপাশি, দেশীয় পরিসরের বাইরে চিন্তা করতে অভ্যস্ত হবার দরুন, যা তখনকার যুগের পরিপ্রেক্ষিতে তাঁর লক্ষণীয় বৈশিষ্ট্য, তিনি পৃথিবীর সঙ্গে যোগাযোগের ভাষা হিসাবে ইংরাজির জন্যই ওকালতি করতেন।

পরের অংশ আগামী সংখ্যায়

উমা

দেশলাই বাক্সে সামাজিক বার্তা

উৎপল সান্যাল

সেই কবে, ১৮৩২-এ ইংল্যান্ডের জন ওয়াকার পটাশিয়াম ক্লোরেট আর অ্যান্টিমনি সালফাইড মিশিয়ে শিরিস কাগজে ঘষে লুসিকার দেশলাই তৈরি করেছিলেন। ঐ সময়ই ফরাসি

বিজ্ঞানী শার্ম সোরিয়া সাদা ফসফরাস দিয়ে দেশলাই তৈরি করেন, যা স্যাঁতসেঁতে আবহাওয়াতেও জ্বালানো যেত। কিন্তু ওর বিপদ ছিল, সামান্য ঘষা লাগলেই জ্বলে উঠত। এমনকি একটু বেশি তাপমাত্রায় আপনিই জ্বলে উঠত। তাই পকেটে রাখা যেত না। ১৮৪৫ সালে লাল ফসফরাস আবিষ্কৃত হলে সুইডেনের জে লুন্ডস্ট্রম ১৮৫৫-য় নিরাপদ বা সেফটি ম্যাচের পেটেন্ট নেন। সহজেই আগুন জ্বালা যায় বলে এই নিরাপদ দেশলাই দ্রুত জনপ্রিয় হয়। সুইডেন থেকে পেটি পেটি দেশলাই সারা পৃথিবী ছড়িয়ে পড়ে। ভারতে ঠিক কবে আসে তা বলা মুশকিল। তবে রসরাজ অমৃতলাল বসুর স্মৃতিকথায় ফেরিওয়ালাদের দেশলাই ফেরি করে বেড়ানোর উল্লেখ আছে (১৮৬৪ সাল নাগাদ)। রবীন্দ্রনাথের 'জীবনস্মৃতি'তেও স্বদেশী দেশলাই তৈরির ব্যর্থ প্রচেষ্টার উল্লেখ পাওয়া যায়। রামকৃষ্ণ কথামৃত-র ১৪ ডিসেম্বর ১৮৮২-র দিনলিপিতে দেখা যায় শ্রীরামকৃষ্ণ বলছেন 'বিষয়বুদ্ধির লেশমাত্র থাকলে তাকে দর্শন হয় না। দেশলাইয়ের কাঠি যদি ভিজে থাকে হাজার ঘষলেও কোনোরকমেই জ্বলবে না। কেবল একরাশ কাঠি লোকসান হয়- বিষয়াসক্ত মন ভিজে দেশলাই।' ১৮৮৪-তে কবি হেমচন্দ্র দেশলাইয়ের স্তব রচনা করেছেন: 'নমামি বিলাতি অগ্নি- দেশলাই রূপী/ চাঁচাছোলা দেহখানি, শিরে কালো টুপি।' অন্য লেখকদের রচনায় ও পত্রপত্রিকায় দেশলাই সংক্রান্ত নানা লেখা ও খবর পাওয়া যায়। তখন দেশলাই আসত সুইডেন, অস্ট্রিয়া, জার্মানি, ইংল্যান্ড ইত্যাদি দেশ থেকে। জাপান থেকেও। পরে কলকাতার আশেপাশে কয়েকটি এবং প্রধানত দক্ষিণ ভারতের বিভিন্ন জায়গায় ছোটবড় অসংখ্য কারখানা গড়ে ওঠে। সে সময় দেশলাই কাঠের বাক্সে পাওয়া যেত যার একদিকেই ছবি ছাপা থাকত— দেবদেবী,

পৌরাণিক চরিত্র, দেশবরেণ্য জাতীয় নেতার পাশাপাশি পশুপাখি, ফুল ইত্যাদি।

দেশলাই–সংগ্রহ হাতড়ালে তাতে ইতিহাস ও সমাজের নানা বিবর্তন ও বার্তা ধরা পড়ে। ১৯০৫ সালে বঙ্গভঙ্গ–বিরোধী আন্দোলন ও স্বাধীনতার আন্দোলন শুরু হওয়ার পর দেশলাইয়ে স্বদেশীবার্তা পৌঁছে দেওয়া শুরু হয়। ইংরেজ শাসকের ভয়ে কিছু দেশলাইবাক্সে প্রস্তুতকারকের নাম ছাপা হত না। 'স্বাধীনতা সম সুখ নাই; নিরুৎসাহ হয়ো না বাঙ্গালী; বিদেশী পণ্য বর্জন ও স্বদেশী পণ্য গ্রহণ' ইত্যাদি বার্তার পাশাপাশি বন্দে মাতরম, ভারতমাতা, হিন্দমাতা ইত্যাদিও লেখা হত।

স্বাধীনতার পর বহু বিচিত্র বিষয় উঠে আসতে থাকে। যা শুধু বিনোদনমূলক নয়, শিক্ষাপ্রদও। ১৯৮০–র আশপাশে কাঠের বাক্সের পাশাপাশি মেশিনে তৈরি কার্ডবোর্ডের বাক্সের দেশলাই তৈরি হতে থাকে। কার্ডবোর্ডের বাক্সের দু দিকেই ছবি ছাপার সুবিধে থাকায় সামনের দিকে মূল ছবি, পিছনে বিচিত্র সব বার্তা আর বিজ্ঞাপন শুরু হয়। বিজ্ঞাপন জগতে দেশলাই অনন্য স্থান অধিকার করছে। কারণ দৈনন্দিন জীবনে এটি প্রয়োজনীয়। এর সাহায্যে অনেক কম খরচে বহু মানুষের কাছে পৌঁছনো যায়।

১৯৬৫–তে ভারত–পাকিস্তান যুদ্ধের পর লালবাহাদুর শাস্ত্রীর প্রধানমন্ত্রিত্বের সময় 'জয় কিষাণ জয় জওয়ান' স্লোগানটি অত্যন্ত জনপ্রিয় হয়। এই সেদিনও তা ছাপা হয়েছে। ইন্দিরা গান্ধীর ২০ দফা কর্মসূচিও দেখা গেছে। পরিবার পরিকল্পনা কর্মসূচি 'হম দো হমারা দো', 'ছোট পরিবার সুখী পরিবার', '১৮ বছরের পরেই তবে বিবাহ আর মা হওয়া ২০ পার করে' ইত্যাদি বিভিন্ন ভাষায় ছাপা হয়েছে।

বিশ্বস্বাস্থ্য সংস্থার পোলিও নির্মূলকরণ কর্মসূচিতে অন্যান্য মাধ্যমের পাশাপাশি দেশলাই বাক্সেও প্রচার হত। টিকা দেওয়ার নির্দিষ্ট দিন জানিয়ে দিত বিখ্যাত উইমকো কোম্পানি। ক্যান্সার সচেতনতা কর্মসূচিতেও দেশলাই অন্তর্ভুক্ত। রেডিয়াম আবিষ্কারক মাদাম কুরির ছবি ছাপা হয়েছে। নেদারল্যান্ডসের কুইন উইলহেলমিনা ক্যান্সার ফান্ডে দেশলাই বিক্রির টাকা দেওয়া হয়েছে। ইজরায়েলের দেশলাইয়ে চামড়ার ক্যান্সার প্রতিরোধক বার্তা দেওয়া হয়েছে। ধূমপান সহ বিভিন্নভাবে তামাকের ব্যবহার নানান আঙ্গিকে দেশলাইয়ের ছবিতে ফুটে উঠেছে। ফ্রান্সের এক বাক্সে দেখা যাচ্ছে, তামাকের কটু গন্ধে মোনালিসা ভুরু কুঁচকে তাকিয়ে। ২০০৫–এ গোয়ার একটি হোটেলের নিজস্ব বাক্সে লেখা ছিল 'Light Candles Not Cigarettes'। ১৯৯০ থেকে ২০১০, সারা বিশ্বেই এইডস সচেতনতায় দেশলাই ব্যবহার হয়েছে। একটি ভারতীয় দেশলাইয়ের পিছনে লেখা হয়েছে, 'Only wife Avoid AIDS।' রক্তদানকেও উৎসাহিত করা হয়েছে। পর্তুগালের একটি চমৎকার দেশলাই বাক্সে হিমোফিলিয়া রোগের লোগো সহ নানা তথ্য সুন্দরভাবে তুলে ধরা হয়েছে। রেডক্রসের ওপরেও দেশলাই বিভিন্ন দেশ থেকে পাওয়া গেছে। চক্ষুদান নিয়ে সুন্দর সুন্দর বার্তাবহ দেশলাই আছে। একটি বাক্সে লেখা, Strike a light for the blind। অন্ধদের সাহায্য করার কথা বলা হয়েছে। আবার নবজাতকের টীকাকরণ সম্বন্ধে সচেতন করা, আঘাতপ্রাপ্ত ব্যক্তিকে কীভাবে ব্যান্ডেজ বাঁধতে হবে–সহ পরিবেশরক্ষার বিষয় দেশলাই বাক্সে অত্যন্ত গুরুত্বের সঙ্গে বিবেচিত হয়েছে। 'জলের অপচয় বন্ধ করা, বৃষ্টির জল ধরে রাখা, রাস্তাঘাট পরিষ্কার রাখা, গাছ লাগানো' ইত্যাদি ছাপানো হয়েছে। এক জায়গায় দেখি, 'করব মোরা মাছের চাষ/থাকব সুখে বারো মাস।'

এখন যে যে সামাজিক বার্তা দেখা যায় তার মধ্যে আছে জ্বালানি বাঁচাও, স্বচ্ছ ভারত অভিযান, বেটি বাঁচাও, বেটি পড়াও ইত্যাদি। শিশুশ্রম বিরোধী দেশলাই পাওয়া গেছে। ১৯৯৬ সালের দুর্গাপুজোর সময় কলকাতা পুলিশ থেকে ট্রাফিক আইন মেনে উৎসবের আনন্দ বাড়িয়ে তোলার ডাক দেওয়া হয়েছে।

দেশলাইয়ের ছবিতে শেক্সপিয়ারের বিখ্যাত নাটকের নাম যেমন এসেছে, দেশপ্রেমের বাণী, স্বামীজির বাণীও এসেছে। ছোট্ট এই দেশলাই বাক্সেই ধরা রয়েছে ইতিহাস ও সমাজের বিবর্তনের ধারা।

উমা

বাণিজ্যিক নয় মানবিক

স্বাস্থ্যের বৃত্তে

স্বাস্থ্য, রোগ, চিকিৎসা, বিজ্ঞান ও সমাজ নিয়ে আপনার সহমর্মী দ্বিমাসিক পত্রিকা

প্রাপ্তিস্থান: পাতিরাম, বুকমার্ক, পিপল্‌স বুক সোসাইটি, বইচিত্র, অম্লান দত্ত বুক স্টল (বিধাননগর পুরসভা), শ্রমিক-কৃষক মৈত্রী স্বাস্থ্যকেন্দ্র (চেঙ্গাইল), ডাঃ শুভজিৎ ভট্টাচার্য (উষুমপুর মিনিবাস স্ট্যান্ডের কাছে, আগরপাড়া), শেয়ালদা মেন সেকশনের বিভিন্ন বইয়ের স্টল।

পাঠক এবং এজেন্টদের যোগাযোগ করার **ফোন নম্বর**: ৯৮৪০৯-২২১৯৪ বা ৯৩৩১০ -১২৬৩৭।

জিন সম্পাদিত দুই শিশুকন্যা নিয়ে বিজ্ঞানের আঙিনায় ঝড়

সুশান্ত মজুমদার

গত কয়েক মাসে, দুবার এইচআইভি সংক্রান্ত গবেষণা এবং জিনগত পরিবর্তনের মাধ্যমে চিকিৎসা— এ বিষয়টি পৃথিবীর বিভিন্ন সংবাদমাধ্যমে ব্রেকিং নিউজ হিসাবে উঠে এসেছে। প্রথমবার, গত ২০১৮-র নভেম্বর মাসের শেষ সপ্তাহে, যখন চীনা বৈজ্ঞানিক হে জিয়ানকুই ঘোষণা করেন যে, তিনি জিন সম্পাদিত যমজ এমন দুই শিশুকন্যাকে পৃথিবীতে আনতে সফল হয়েছেন, যারা এইচআইভি প্রতিরোধ ক্ষমতা নিয়েই জন্মেছে। এটা সারা পৃথিবীতে হৈচৈ ফেলে দিলেও, দুনিয়ার বৈজ্ঞানিক মহলে প্রবলভাবে ধিকৃত হয়। এমনকি, একশোর বেশি চীনা বায়োমেডিকাল গবেষক হে-র এই পদক্ষেপকে হঠকারী হিসাবে চিহ্নিত করে আশঙ্কা প্রকাশ করেন, এর ফলে জিনোম সংক্রান্ত গবেষণায় অর্থের জোগানে টান পড়তে পারে। (Cyranoski David & Ledford Heidi, 26 NOVEMBER 2018)

হে জিয়ানকুই

কিন্তু গত ৫ই মার্চ (২০১৯) 'নেচার' পত্রিকায় প্রকাশিত একটি গবেষণাপত্রে ইউনিভার্সিটি কলেজ অভ লন্ডন ও ইম্পিরিয়াল কলেজ, লন্ডন-এর একদল চিকিৎসক-গবেষক দাবি করেন, অস্থিমজ্জা (স্টেম সেল) প্রতিস্থাপনের মাধ্যমে এইড্‌স এবং রক্তের ক্যানসারে আক্রান্ত এক রোগীকে তাঁরা সম্পূর্ণভাবে এইড্‌স-মুক্ত করতে সফল হয়েছেন। যেখানে হে জিয়ানকুইর কপালে জুটেছে ধিক্কার, সেখানে ইউনিভার্সিটি কলেজ অভ লন্ডন ও ইম্পিরিয়াল কলেজ, লন্ডন-এর গবেষকগণ পৃথিবীর প্রায় এক কোটি এইড্‌স আক্রান্ত মানুষকে আশার আলো দেখানোর জন্য পেয়েছেন অসংখ্য কুর্নিশ। কেন এই ভিন্ন প্রতিক্রিয়া জানতে হে কীভাবে যমজ শিশুকন্যার মধ্যে এইচআইভি প্রতিরোধ ক্ষমতা যুক্ত করতে সফল হন, তা বুঝে নেওয়া দরকার।

বৈজ্ঞানিক হে জিয়ানকুই কেন সমালোচিত হচ্ছেন?

আমাদের শ্বেতকণিকার, যা শরীরে প্রতিরোধ ক্ষমতা জোগায়, উপরিভাগে CCR5 নামক একটি জিন আছে। এইচআইভি ভাইরাস এর হাত ধরেই মানবকোষের অভ্যন্তরে প্রবেশ করে। বৈজ্ঞানিক পরিভাষায় এদের বলে রিসেপটার। ১৯৯৬ সালে বিজ্ঞানীরা কিছু মানুষের দেহকোষে এর একটি পরিবর্তিত জিনের (মিউটেটেড) সন্ধান পান, যা CCR5-Δ32 নামে চিহ্নিত। এই পরিবর্তিত জিনের মাধ্যমে এইচআইভি ভাইরাস মানবকোষের অভ্যন্তরে প্রবেশ করতে পারে না। ফলে দেখা গেছে, যাদের শরীরে CCR5-এর জায়গায় CCR5-Δ32 জিনটি বর্তমান তাদের এইচআইভি ভাইরাস প্রতিরোধ ক্ষমতাও আছে। অর্থাৎ, তিনি এইচআইভি ভাইরাসে আক্রান্ত হবেন না। যেহেতু হে-র গবেষণাপত্র কোথাও প্রকাশিত হয়নি, তাই ঠিক জানা যাচ্ছে না, কী পদ্ধতিতে তিনি যমজ কন্যাদের মধ্যে এইচআইভি প্রতিরোধ ক্ষমতা নিয়ে এসেছেন। তবে একটি কনফারেন্সে তিনি বলেছেন, এই পরিবর্তনের লক্ষ্যে তিনি CCR5 জিনকেই টার্গেট করেছেন। বিশ্বের চিকিৎসা ও জিন সংক্রান্ত গবেষণার সঙ্গে যুক্ত বিজ্ঞানীরা, মূলত দুটি কারণে হে জিয়ানকুইর গবেষণাকর্মের বিরোধিতা করেছেন (Cyranoski: 30 NOVEMBER 2018)।

প্রথমত, CCR5 যেমন এইচআইভি ভাইরাসের রিসেপটার তেমনি আবার বহু সংক্রামক অসুখের ক্ষেত্রে তার ইতিবাচক ভূমিকাও রয়েছে। গত ১২ ডিসেম্বর ২০১৮ নেচার পত্রিকায় প্রকাশিত একটি প্রতিবেদনে পৃথিবীর একাধিক প্রথিতযশা বৈজ্ঞানিকের মন্তব্য উদ্ধৃত হয়েছে (Cyranoski: 12 DE-

CEMBER 2018)। তাঁরা যেটা বলেছেন তার মর্মার্থ হল— মূল CCR5 জিনটি আমাদের ফুসফুস, লিভার এবং মস্তিস্কের বহু সংক্রামক অসুখে ইতিবাচক ভূমিকা গ্রহণ করে। বিজ্ঞানীরা CCR5 জিনের পরিবর্তনে ওয়েস্ট নিল ও ইনফ্লুয়েঞ্জা, এই দুটি মারণ ভাইরাসের হানার প্রভাব সম্পর্কে চিন্তিত। ওয়েস্ট নিল ভাইরাসের আক্রমণ আফ্রিকা, ইউরোপ এবং আমেরিকাতে হয়। অন্যদিকে ইনফ্লুয়েঞ্জা পৃথিবীর প্রায় সর্বত্র চিন্তার কারণ, বিশেষভাবে চীনে এর প্রকোপ খুবই বেশি। ক্যালিফোর্নিয়া বিশ্ববিদ্যালয়ের (রিভারসাইড) অধ্যাপক মার্কাস কলের মতে একাধিক গবেষণায় এটা প্রমাণিত যে, যাঁরা CCR5-Δ32 জিন বহন করছেন, তাঁরা বিভিন্ন টিক (এক ধরনের আটপেয়ে কীট) বাহিত রোগের সংক্রমণে গুরুতর এনসেফালাইটিসের শিকার হন। এইসব কারণেই, পৃথিবীর অন্যান্য বিজ্ঞানীরা প্রশ্ন তুলেছেন, একজন বিজ্ঞানী এককভাবে কী করে এত বড় একটা সিদ্ধান্ত নিলেন? এর ফলে যে শিশু দুটি জন্মাল, তাদের যে অন্যান্য অসুখের প্রতিরোধ ক্ষমতা হ্রাস পাবে না, এর নিশ্চয়তা কোথায়?

হে-র সমালোচিত হওয়ার দ্বিতীয় কারণটি নীতিগত। মায়ো ক্লিনিকের বায়োএথিসিস্ট মেগান অ্যালিসে বলেছেন, কন্যাদ্বয়ের পিতামাতা ও অন্য যে সমস্ত দম্পতি বিজ্ঞানী হে-র এই গবেষণায় অংশগ্রহণকারী ছিলেন, তাঁদের কাছ থেকে তিনি এই গবেষণা সংক্রান্ত যে অনুমতিপত্র নিয়েছেন, তাতে এই সমস্ত আশঙ্কাগুলি পরিষ্কারভাবে জানানো হয়েছে বলে তাঁর মনে হয় নি। তিনি গোটা অনুমতিপত্র পদ্ধতিটিকে 'বিপর্যয় (ডিজাস্টার)' হিসাবে চিহ্নিত করেছেন।

ইউনিভার্সিটি কলেজ অভ লন্ডনের চিকিৎসক-গবেষকেরা কেন আদৃত?

বারো বছর আগে, বার্লিনের একটি হাসপাতালে একই সঙ্গে এইড্‌স এবং রক্তের ক্যানসারে আক্রান্ত টিমোথি রে ব্রাউন নামে এক রোগীর ক্যানসারের চিকিৎসার জন্য অস্থিমজ্জা প্রতিস্থাপন করে চিকিৎসকেরা দেখেন যে, এইড্‌স আর ক্যানসার দুটি রোগই তাঁর শরীর থেকে একসঙ্গে নির্মূল হয়েছে। টিমোথি এখনও বেঁচে। এই সাফল্যের পরে পৃথিবীর নানান দেশের চিকিৎসক-গবেষকেরা অস্থিমজ্জা প্রতিস্থাপনের মাধ্যমে এইড্‌স নিরাময়ে চেষ্টা করে আসছেন। কিন্তু কোনোটাই সফল হয়নি। শেষ পর্যন্ত সাফল্য এল ইউনিভার্সিটি কলেজ অভ লন্ডন ও ইম্পিরিয়াল কলেজ, লন্ডন-এর গবেষকদের। এঁদের সহযোগী ছিলেন কেম্ব্রিজ ও অক্সফোর্ড বিশ্ববিদ্যালয়ের গবেষকেরা।

রক্তের ক্যানসারে আক্রান্ত রোগীদের অস্থিমজ্জা প্রতিস্থাপন হয়েই থাকে। কিন্তু এক্ষেত্রে কেম্ব্রিজ বিশ্ববিদ্যালয়ের চিকিৎসক-গবেষক রবীন্দ্র গুপ্তর টিম এমন একজন অস্থিমজ্জাদাতা বাছলেন, যাঁর শরীরে দু কপি (অর্থাৎ বাবা ও মা দুজনের কাছ থেকেই পাওয়া) পরিবর্তিত CCR5-Δ32 জিন বর্তমান। দেখা গেছে, শতকরা এক শতাংশ ইউরোপীয় মানুষ এমন দু কপি জিন বহন করেন। এই অস্থিমজ্জা প্রতিস্থাপনের পরে প্রথম ষোল মাস চিকিৎসকেরা ওই রোগীকে নিয়মিতভাবে এইড্‌স প্রতিরোধকারী ওষুধ দিয়ে গেছেন। তারপর ওষুধ বন্ধ করে দিয়ে আঠারো মাস ক্রমাগত পরীক্ষার মাধ্যমে লক্ষ্য রেখেছেন, রোগীর দেহে এইড্‌স ভাইরাসের দেখা মিলছে কিনা। যখন ফলাফল নিশ্চিতভাবেই নেগেটিভ হল, তখনই তাঁরা গবেষণালব্ধ ফলাফল প্রকাশের সিদ্ধান্ত নেন। (Gupta Ravindra, 5 MAR 2019)

ওপরের আলোচনা থেকেই পরিষ্কার হয়ে যায়, হে জিয়ানকুইনের সঙ্গে ব্রিটেনের চারটি বিশ্ববিদ্যালয়ের গবেষকগণের গবেষণা সম্পর্কে চিন্তা ও পদ্ধতির ফারাক। জিন সম্পাদিত দুই শিশুকন্যার জন্মের ঘোষণার পরেই চিনের সাদার্ন ইউনিভার্সিটি অভ সায়েন্স অ্যান্ড টেকনোলজি কর্তৃপক্ষ জানায়, তারা হে-র এই গবেষণা সম্পর্কে কিছুই জানত না, কারণ এই পরীক্ষাটি তাদের বিশ্ববিদ্যালয়ের গবেষণাগারে হয় নি। এবং ২০১৮-র ফেব্রুয়ারি মাস থেকে তিনি ছুটিতে আছেন।

অন্যদিকে, ব্রিটিশ বিশ্ববিদ্যালয়ের গবেষকগণের গবেষণা পুরোটাই স্বচ্ছ প্রক্রিয়ায় চলেছে। ৫ই মার্চ (২০১৯) ইউনিভার্সিটি কলেজ অভ লন্ডন সর্বসাধারণের জন্য একটি ঘোষণায় এই গবেষণার একটি সারসংক্ষেপ প্রকাশ করে (PUBLIC RELEASE: 5 MAR 2019)। তারা আরও জানায়, এই গবেষণার অর্থ জুগিয়েছে ওয়েলকাম, মেডিকাল রিসার্চ কাউন্সিল এবং আরও তিনটি সংস্থা।

আসলে, মানবদেহ সম্পর্কিত গবেষণা এমন একটি স্পর্শকাতর বিষয় যে, সেটি সম্পূর্ণ স্বচ্ছতার সঙ্গে করা অবশ্যকর্তব্য। তাছাড়া, গবেষণাটিতে অংশগ্রহণকারী যখন একজন প্রাপ্তবয়স্ক, তখন এই গবেষণায় তিনি অংশ নেবেন কিনা, সে ব্যাপারে তাঁর নিজস্ব সিদ্ধান্তই শেষ কথা। তাঁর ওপর কিছু চাপিয়ে দেওয়ার প্রশ্নই ওঠে না। ভূমিষ্ঠ শিশু দুটির মধ্যে পরিবর্তিত জিনকে প্রতিস্থাপন করে হে জিয়ানকুইন একটি গর্হিত অপরাধ করেছেন।

এখন কী কর্তব্য?

জিন সম্পাদিত দুই শিশুকন্যার জন্মের ঘোষণার পর থেকেই পৃথিবীতে এই ধরনের গবেষণায় একটা রাশ টানার জন্য অনেকেই বিভিন্ন দেশে আইন প্রণয়নের কথা বলছেন। চিনের স্বাস্থ্য মন্ত্রকের নির্দেশে হে-র বিরুদ্ধে তদন্ত শুরু হয়েছে, কারণ তিনি নাকি এই গবেষণা দ্বারা ওই মন্ত্রকের ২০০৩-এর নির্দেশিকা লঙ্ঘন করেছেন। মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রে অনেকেই এই ধরনের গবেষণা পুরোপুরি নিষিদ্ধ করার পক্ষে। কিন্তু এটা বিজ্ঞানীদের পক্ষে মেনে নেওয়া অসম্ভব, কারণ তাহলে জ্ঞানের প্রসার সঙ্কুচিত হবে। নোবেলজয়ী জীববিজ্ঞানী ডেভিড বাল্টিমোর এই মানসিকতাকে 'Antithetical to goals of science' আখ্যা দিয়েছেন (Cyranoski: 30 NOVEMBER 2018)। যদিও ব্রিটেনে জিন-সম্পাদিত শিশুর সৃষ্টি আইনসিদ্ধ নয় কিন্তু সেই দেশের সম্মাননীয় প্রতিষ্ঠান ন্যুফিল্ড কাউন্সিল অন বায়োএথিক্সের মতে যদি দেখা যায় ডিএনএ সম্পাদনা না করলে কোনো শিশু গুরুতর কোনো অসুখ নিয়ে জন্মাতে পারে, তাহলে জিন সম্পাদনা করা যেতেই পারে। (Sample: 9 October 2018)

বাল্টিমোর একটি সাক্ষাৎকারে বলেছেন, ঠিক কীভাবে জিন সম্পাদনা নিয়ন্ত্রণ করা যেতে পারে তার কোনো নকশা তাঁদের কাছে নেই। গত নভেম্বরে (২০০৮) হংকংয়ে অনুষ্ঠিত Second International Summit on Human Genome Editing-এর পরিসমাপ্তিতে সামিটের অর্গানাইজিং কমিটির পক্ষ থেকে যে বিবৃতি প্রকাশ করা হয় তাতে প্রত্যেক দেশের বিজ্ঞান অ্যাকাডেমিগুলিকে অনুরোধ করা হয়েছে, তারা যেন নিজেদের সরকারের কাছে এ বিষয়ে তাদের সুপারিশ জমা দেয়। এবং সুপারিশগুলি তৈরির সময় বিভিন্ন বিজ্ঞান অ্যাকাডেমিগুলি যেন নিজেদের মধ্যে যোগাযোগ রেখে কাজটা করে।

এই কমিটি একটি আন্তর্জাতিক ফোরাম তৈরির কথাও বলেছে, যেখানে এই সংক্রান্ত বিভিন্ন দেশের গবেষণা ও ক্লিনিকাল ট্রায়ালের ব্যবস্থা একটি রেজিস্ট্রি দ্বারা পরিচালিত হবে। কিন্তু অনেকেই এইসব নিয়ন্ত্রণের সাফল্য সম্বন্ধে সন্দিহান, কারণ এই জাতীয় গবেষণার সঙ্গে পৃথিবীর এত প্রতিষ্ঠান যুক্ত যে, এর যথাযথ নিয়ন্ত্রণ অসম্ভব।

এক বিজ্ঞানীর মতে, যে গবেষণাগারেই আণবিক জীববিদ্যার চর্চা হয়ে থাকে, তাদের পক্ষেই এই জিন সম্পাদনা সম্ভব। কিন্তু এই সীমাবদ্ধতার কথা মাথায় রেখেই আমাদের এই ব্যাপারে পদক্ষেপ নেওয়ার প্রয়োজন আছে। হংকং সামিটের অর্গানাইজিং কমিটির সদস্য অল্টো চারোকে উদ্ধৃতি করে বলা চলে, 'বাস্তবটা হচ্ছে, আপনি নিখুঁত কিছু আশা করতে পারেন না। আপনি আইনি ব্যবস্থা ও শাস্তির মাধ্যমে এই ধরনের দুর্বৃত্তসুলভ আচরণে লাগাম পরাতে পারেন।' (Cyranoski: 30 NOVEMBER 2018)

তথ্যসূত্র

১। Cyranoski David, Baby gene edits could affect a range of traits: 12 DECEMBER 2018:nature, NEWS (HTTPS://WWW.NATURE.COM/ARTICLES/D41586-018-07713-2)

২। Cyranoski David, First CRISPER babies: six questions that remain: 30 NOVEMBER 2018: nature, NEWS (https://www.nature.com/articles/d41586-018-07607-3)

৩। Cyranoski David & Ledford Heidi, International outcry over genome-edited baby claim: 26 NOVEMBER 2018:nature (https://www.nature.com/articles/d41586-018-07545-0)

৪। Ricard Paul, What are the ethics of baby gene-editing?: 1 DECEMBER,2018: medicalxpress (https://medicalxpress.com/news/2018-12-ethics-baby-gene-editing.html)

৫। Warren Matthew, Second patient free of HIV after stem cell therapy: 30 NOVEMBER 2018: nature NEWS (HTTPS://WWW.NATURE.COM/ARTICLES/D41586-019-00798-3)

৬। UNIVERSITY COLLEGE LONDON, HIV remission achieved in second patient: PUBLIC RELEASE: 5 MAR-2019 (https://www.eurekalert.org/pub_releases/2019-03/ucl-hra030419.php)

৭। Gupta Ravindra, A second person has experienced sustained remission from HIV-1 after ceasing treatment, according to a study published today in Nature (https://www.cam.ac.uk/research/news/hiv-remission-achieved-in-second-patient)

৮। Sample Ian, Genetically modified babies given go ahead by UK ethics body: 9 October 2018: The Guardian (https://www.theguardian.com/science/2018/jul/17/genetically-modified-babies-given-go-ahead-by-uk-ethics-body)

বিজ্ঞানের ঐতিহ্য ঠেকল গাঁজাখুরি গপ্পে!

ভবানীপ্রসাদ সাহু

এখন আমাদের দেশে 'মূর্খের অবিজ্ঞান' (ননসেনসিক্যাল আনসায়েন্স')–এর চর্চা চলছে। আগেও কুসংস্কার ও ধর্মের নামে নানা মিথ্যাচার ছিলই। কিন্তু বিগত কয়েক বছরে 'আরএসএস'–এর চিন্তাভাবনায় অনুপ্রাণিত কিছু হিন্দুত্ববাদী, ভারতীয় ঐতিহ্যের নামে যে হাস্যকর কথাবার্তা বলছে, তা এক বিশেষ মাত্রা পেয়েছে। এমনকি বিজ্ঞানের মুখোশ পরিয়েও এসবের প্রচার করা হচ্ছে। ভারতীয় জাতীয় বিজ্ঞান কংগ্রেসের মতো গুরুত্বপূর্ণ একটি বিজ্ঞান সম্মেলনের মঞ্চকেও এই অসভ্যতার জন্য ব্যবহার করা হচ্ছে!

গত ১৫ই জানুয়ারি,২০১৯ এশিয়াটিক সোসাইটির ২৩৬তম প্রতিষ্ঠাবার্ষিকী উদ্‌যাপন অনুষ্ঠানে, ইনস্টিটিউট অভ ডেভেলপমেন্ট স্টাডিজ–এর এমিরেটাস অধ্যাপক অমিয়কুমার বাগচী 'ভারতীয় বিশ্বাসে বিজ্ঞান, অবিজ্ঞান ও বহুত্ত্ববাদ' শীর্ষক বিষয়ে বক্তব্য পেশ করতে গিয়ে সরাসরি এই ধরনের মন্তব্য করলেন।

প্রাচীন ভারতে সমসাময়িক বিশ্বের অন্যান্য অংশের তুলনায় বিজ্ঞানের চর্চা ও আবিষ্কার এবং ঐ অনুসারী চিন্তাভাবনা যথেষ্টই অগ্রসর ছিল। অঙ্ক, জ্যোতির্বিদ্যা, চিকিৎসাবিদ্যা, শল্যবিদ্যা ইত্যাদি ক্ষেত্রে ঐ ভারতীয় প্রাগ্রসরতাকে পরোক্ষভাবে উপেক্ষা করে, এখন যেভাবে গণেশের হাতির মাথাকে প্লাষ্টিক সার্জারির ফসল, কৌরবদের শত ভ্রাতার জন্ম টেস্ট টিউব বেবির প্রমাণ, পুষ্পকরথ মানে আধুনিক বিমানের চেয়েও উন্নততর আকাশযান (এবং তা নাকি গোমূত্রেও চালানো হত), নিউটন আইনস্টাইন ডারউইন স্টিফেন হকিং–এর মতো বিজ্ঞানীদের সব আবিষ্কারই বেদে ছিল তথা প্রাচীন ভারতে করা হয়েছিল ইত্যাদি হাবিজাবি কথাবার্তা বলা হচ্ছে, তা ভারতীয় মনন ও বিশ্বাসকে এক ভয়াবহ বিকৃতির দিকে ঠেলে দিচ্ছে।

অধ্যাপক বাগচী বলেন, বিজ্ঞানীরাও নানা বিকৃতির ও অবৈজ্ঞানিক চিন্তার শিকার হন। যেমন জিন–এর ডাবল হেলিক্স–এর আবিষ্কর্তা ওয়াটসন পর্যন্ত এক সময় বলেছিলেন যে, কালো মানুষেরা সাদা মানুষদের চেয়ে জিনগত ভাবেই নিকৃষ্ট। এখন আমেরিকার ট্রাম্প একই ধরনের ভাবনার শরিক। হিটলারও ছিল একই মানসিকতায় জারিত। ইভাঞ্জেলিক্যালরা ছিল তুলনামূলকভাবে কম শিক্ষিত এবং বর্ণবিদ্বেষী। এরা সবই ঐ গোত্রের। এখনকার ভারতে হিন্দুত্ববাদীদের মধ্যেও এর ছায়া দেখা যাচ্ছে, যা ভিন্নধর্ম, দলিত ও মুক্তচিন্তার মানুষদের প্রসারিত।

'হিন্দু' শব্দটা নিয়ে এখন এত মাতামাতি, অথচ আমাদের পূর্বপুরুষেরা হাজার বছর আগে শব্দটাকে নিজেদের জাতি বা ধর্মের সংজ্ঞারূপে ব্যবহারই করেননি। আমাদের বিশাল

> এ দেশের মন্দিরগুলোকে বহিরাগত মুসলিম বিজেতারা ধ্বংস করেছে, লুণ্ঠন করেছে। কিন্তু ব্যাপারটির মধ্যে কোনো ধর্মীয় বিষয় নেই। সবসময়ই বিজেতারা বিজিত এলাকার সম্পদ লুণ্ঠন করেছে, ধর্মের বাছবিচার না করেই। হিন্দু রাজারাও মন্দিরের সম্পদ লুণ্ঠন করত। যেমন কলহনের 'রাজতরঙ্গিনী'তে (হিন্দু) রাজাদের জন্য পরামর্শ ও নির্দেশ দেওয়া হয়েছে যে, প্রয়োজনে মন্দিরের সম্পদ লুণ্ঠন করতে হবে, বিশেষত যখন কোষাগারে টান পড়বে। এবং তা করা হতও।

বৈদিক সাহিত্য পুরাণ ও ধর্মশাস্ত্রে— কোথাও হিন্দু শব্দের উল্লেখ নেই। যখন মুসলমানেরা জয়ী হয়ে উত্তরভারতে বসবাস করতে থাকে, তখন বিজিত ভারতীয়দের সঙ্গে নিজেদের পার্থক্য করার জন্য তারা 'হিন্দু' শব্দের প্রথম ব্যবহার করে। এই বিদেশি শব্দটির উৎপত্তি অনেক আগেই হয়েছিল। পশ্চিম দিক দিয়ে যারা স্থলপথে ভারতে আসত, তারা সিন্ধুনদের নামানুসারে তীরবর্তী দেশকেও ঐ নামে

অভিহিত করত। কিন্তু পারসিকেরা দন্ত্য স–এর জায়গায় 'হ' উচ্চারণ করতে অভ্যস্ত বলে তারা ঐ নদী ও তীরবর্তী দেশকে হিন্দু বলত। এইভাবেই সপ্ত সিন্ধুর বদলে ওদের বইতে হপ্ত হিন্দুর উল্লেখ পাওয়া যায়। পারসিকেরা যেমন দন্ত্য স–এর জায়গায় হ বলত, গ্রিকরা আবার শব্দের প্রথম অক্ষর 'হ' উচ্চারণ করত না। তাই তাদের মুখে হিন্দু হয়ে যায় ইন্দু। তা থেকেই ইন্ডো বা ইন্ডিয়া নামের উৎপত্তি। প্রাচীন ভারতের ধর্ম ছিল সনাতন ধর্ম, যার মধ্যে বহুত্ববাদী চিন্তাভাবনা ছিল। প্রাচীন ভারতীয় পরিমণ্ডলে, সমাজে ও জ্ঞানচর্চায়ও এই বহুত্ববাদী অস্তিত্ব স্পষ্ট, যেমন একেশ্বরবাদ (ব্রহ্ম), নানা দেবদেবীর পূজা, বহুপ্রাণবাদ (অ্যানিমিজম ও অ্যানিটামিজম), টোটেন সম্পর্কিত বিশ্বাস ও আচার (টোটেমিজম) চার্বাক চিন্তা তথা লোকায়তিক দর্শন, নিরীশ্বরবাদী বৌদ্ধ ও জৈন দর্শন ইত্যাদি ইত্যাদি। এখনকার আরএসএস তাদের ধর্মীয় কার্যক্রমে আসলে মুসলিম ও ইহুদিদের অনুসরণ করে।

এখনকার হিন্দুত্ববাদীরা ভারতীয় জনমানসে চরম ইসলামবিদ্বেষ ঢুকিয়ে দেওয়ার নোংরা উদ্দেশ্যে এমন চরম প্রচারও চালায় যে, এ দেশের মন্দিরগুলোকে বহিরাগত মুসলিম বিজেতারা ধ্বংস করেছে, লুণ্ঠন করেছে। কিন্তু ব্যাপারটির মধ্যে কোনো ধর্মীয় বিষয় নেই। সবসময়ই বিজেতারা বিজিত এলাকার সম্পদ লুণ্ঠন করেছে, ধর্মের বাছবিচার না করেই। হিন্দু রাজারাও মন্দিরের সম্পদ লুণ্ঠন করত। যেমন কলহনের 'রাজতরঙ্গিনী'তে (হিন্দু) রাজাদের জন্য পরামর্শ ও নির্দেশ দেওয়া হয়েছে যে, প্রয়োজনে মন্দিরের সম্পদ লুণ্ঠন করতে হবে, বিশেষত যখন কোষাগারে টান পড়বে। এবং তা করা হতও। ঘটনা হল, সে সময় এ দেশে কোনো মুসলিম ছিল না।

এই ধরনের হিন্দু পুনরুত্থানবাদী, ঐতিহ্যবাদী অবৈজ্ঞানিক কথাবার্তা অন্যদিকে অক্ষমের নিষ্ফল প্রতিরোধের মানসিকতার বহিঃপ্রকাশ। এ দেশে যখন মুসলিম শাসকেরা আসে, তাদের রণকৌশলে ও শারীরিক ক্ষমতায় পরাজিত করতে না পেরে, তাদের প্রতি ঘৃণা, বিদ্বেষ ও বৈরিতা প্রতিষ্ঠা করার জন্য এই ধরনের ধর্মীয় বিভেদের হীন কৌশল অবলম্বন করে। যেমন কৌলিন্যপ্রথা, গোমাংস ভক্ষণকে চরম অধর্মীয় ঘৃণ্য হিসেবে প্রচার, এবং অন্যান্য নানা তথাকথিত হিন্দু আচার–অনুষ্ঠানকে জোর করে প্রতিষ্ঠা করা। ইংরেজদের ক্ষেত্রেও একই ব্যাপার ঘটেছে। এ দেশকে ব্রিটিশদের উপনিবেশে পরিণত হওয়া আটকাতে না পারার অক্ষমতা ঢাকার, অবচেতন চেষ্টার শুরু হয়, নিজেদের বস্তাপচা ধ্যানধারণাগুলির মাহাত্ম্য প্রচার এবং তাকে ধর্মের রূপ দেওয়া। হাঁচি, টিকটিকি থেকে শুরু করে বেদ মাহাত্ম্য প্রচারের মতো নানাবিধ কাজকর্ম শুরু হয়, যেমন করেছিল শশধর তর্কচূড়ামণির মতো লোকজন। আর এখন আরএসএস সেই উত্তরাধিকার বহন করছে। তাদের অনুগামী নেতামন্ত্রীরা ছাড়াও অজস্র লোকজন। ফলে ভারতীয় জনগণের একটি অংশের বিশ্বাসে ঐ ধরনের একপেশে, অবৈজ্ঞানিক, ভিন্নধর্মবিদ্বেষী মিথ্যাগুলি ক্রমশ প্রতিষ্ঠিত হচ্ছে। লক্ষ্য হচ্ছে, সমাজের এই অংশকে বিভ্রান্ত করে ভোট পাওয়া, ক্ষমতা দখল করা এবং আরো সুনিশ্চিতভাবে নিজেদের হিটলারীয় নাৎসিসুলভ চিন্তা ও কাজকে বাস্তবায়িত করা।

অধ্যাপক বাগচীর সুদীর্ঘ বক্তৃতার কোনো লিখিত কপি ছিল না। তাই তাঁর বক্তব্যের কিছু মূল্যবান অংশ হয়তো বাদ পড়েছে, আবার লেখকের কিছু নিজস্ব ব্যাখ্যাও ঢুকে গেছে। তবে তাঁর বক্তব্যের মূল সুর এবং স্পষ্টভাবে বলা কথাগুলি এই প্রতিবেদনে রয়েছে। বর্তমান পরিপ্রেক্ষিতে এই ধরনের আলোচনা যে কত মূল্যবান, তা নতুন করে বলার অপেক্ষা রাখে না। অধ্যাপক বাগচী সম্পর্কে ও তাঁর বক্তব্য সম্পর্কে মন্তব্য করার সময় এশিয়াটিক সোসাইটির সভাপতি অধ্যাপক ঈশা মহম্মদ ও সম্পাদক অধ্যাপক সত্যব্রত চক্রবর্তীর কথাতেও একই সুর ফুটে ওঠে।

পুরো আলোচনাটি ছিল ইংরেজিতে, উচ্চশিক্ষিত বিদ্বজ্জনের সামনে। এই শ্রোতারা যদি অধ্যাপক বাগচীর বক্তব্যের মূল সুরটি সাধারণ মানুষের মধ্যে প্রসারিত করার আন্তরিক উদ্যোগ নেন, তবেই এই ধরনের আলোচনা আরও সার্থক হবে।

উমা

নতুন দুই বই

বাঁধ বন্যা বিপর্যয়

চেনা বিষয় অচেনা জগৎ

বন্যা ও সাধারণ বিজ্ঞান নিয়ে উৎস মানুষ প্রকাশ করল নতুন দুটি সঙ্কলনগ্রন্থ।

চেনা বিষয় অচেনা জগৎ

যদি কাগজে লেখো নাম

সমীরকুমার ঘোষ

মান্না দে তাঁর এক জনপ্রিয় গানে তাবৎ প্রেমিক-প্রেমিকাকে একে অপরের নাম (অষ্টোত্তর বা একটি যাই হোক) লেখার ব্যাপারে এই মর্মে সতর্ক করেছেন— 'যদি কাগজে লেখো নাম কাগজ ছিঁড়ে যাবে...।' এমনকি পাথরেও লেখা চলবে না, কারণ পাথর ক্ষয়ে যাবে। অতএব সর্বোৎকৃষ্ট পরামর্শটি ছিল, হৃদয়ে লিখে রাখার। সে নাম নাকি রয়ে যাবে! কে কোথায় কার নাম লিখবে তা নিয়ে আমাদের মাথাব্যথা নেই। আমরা এমন কাগজের কথায় আসব, তা না ছিঁড়লেও পুরনো শোক-তাপের মতো তার লেখা আস্তে আস্তে মুছে যায়।

টাকা তোলার জন্য ইদানীং লোকে আর ব্যাঙ্কে যায় না। দু-চার হাত অন্তরই এটিএম ঘর, কোথাও ই-গ্যালারি। ঢুকে পড়লেই হল। প্রায় সঙ্গে সঙ্গে হাতোহাত টাকা মেলে। কোথাও টাকা জমা দেওয়া এবং পাসবুক আপডেটের ব্যবস্থাও থাকে। দিনরাত সচল থাকে বলে আমরা আদর করে এটিএম-এর নাম রেখেছি 'অল টাইম মানি', যখন খুশি টাকা। যদিও আসল কথা 'অটোমেটেড টেলার মেশিন'। টাকা তোলা শুধু নয়, অ্যাকাউন্টে কত আছে, তাও বলে দেয় যন্ত্র। কাজ শেষ হলেই যন্ত্র জানতে চায়, 'প্রিন্ট', মানে ছাপা নথি লাগবে কিনা। হ্যাঁ, জানালেই সুড়সুড় করে মেশিনের গা থেকে বেরিয়ে আসে এক চিলতে কাগজ। অনেকে দেখে নিয়ে আর বয়ে নিয়ে যাওয়ার কষ্ট স্বীকার করেন না, ঘরেতে থাকা ঝুড়িতে ফেলে দেন। কেউ নিয়ে যান। অনেক দোকানে কেনাকাটার পর, হোটেল-রেস্তোরাঁয় খাওয়ার পর, এই ধরনের বিল হাতে ধরিয়ে দেওয়া হয়।

ইসিজি করা বা করানোর অভিজ্ঞতা বহু লোকেরই আছে। এটিএম-এর মতোই ইসিজি যন্ত্র থেকেও বেরিয়ে আসে কাগজ, তবে লম্বায় অনেক বড়। তার ওপরেই চিত্রিত থাকে লাবডুবের ইতিকথা, আমাদের হৃদ্‌স্পন্দন। ডাক্তারবাবু সেটি দেখার পর বলে দেন, ওটির একটি প্রতিলিপি করিয়ে নিতে। কারণ? যত সময় যাবে আস্তে আস্তে লেখা বা রেখা মিলিয়ে যেতে থাকবে। ফ্যাক্স যন্ত্র থেকেও যে প্রতিলিপি বেরোয়, তাও এই কাগজে।

এখন যাঁরা মাঝবয়সী, তাঁদের ছেলেবেলার ভ্যানিশিং ইঙ্ক-এর কথা মনে থাকবে। ছোটদের এটি খেলার উপকরণ ছিল। ছোট ছোট শিশিতে বিক্রি হত, দেখতে কোনোটা কালো, কোনোটা জলের মতো। এই কালো কালি দিয়ে সাদা পাতায় লিখলে লেখাটি কিছুক্ষণ পরেই অদৃশ্য হয়ে যেত। সাদা পাতা যে কে সেই! যেন ম্যাজিক। জলে গুলে যায় এমন অ্যাসিডীয় দ্রবণটি বাতাসের সংস্পর্শে এসেই রঙ হারাত। খাবার সোডা থেকে ভিনিগার অনেক কিছু দিয়ে এটি বানিয়েও নেওয়া যায়। আর জলের মতো দেখতে যেটি, তা দিয়ে সাদা পাতায় লিখলে দেখা যেত না, টেবিল ল্যাম্প বা কোনো হালকা তাপে গরম করে নিলেই পাতায় ফুটে উঠত লেখা। ছোটদের সে ছিল ভারি মজার খেলার জিনিস। যদিও গুপ্তচরদের মধ্যে এই ধরনের কালির ব্যবহার ছিল বহুল, হয়ত এখনও আছে।

ভ্যানিশিং ইঙ্ক কী দিয়ে তৈরি হয়, না হয়, তা এই লেখার বিষয় নয়, আমরা এটিএম স্লিপ, ইসিজি রিপোর্ট বা দোকান-হোটেলের বিল রহস্য নিয়ে মাতব। সময় যত গড়ায়, কেন

ফিকে হতে থাকে লেখা। শেষমেশ হারিয়েই বা যায় কেন!

এই যে স্লিপ বা বিল, এগুলো যে আমাদের বই-খাতার সাধারণ কাগজ নয়, তা বলে দেওয়ার দরকার পড়ে না। এই ধরনের কাগজের পোশাকি নাম 'থার্মাল পেপার'। এটি বিশেষ ধরনের এক কাগজ। খুব পাতলা। তার ওপর এক রাসায়নিক আস্তরণ থাকে। গিরগিটি যেমন ভয় পেলে রঙ বদলে ফেলে, এই পাতাও তাপ পেলে রঙ বদলে ফেলতে পারে। যে প্রিন্টার যন্ত্রে এই কাগজ ব্যবহৃত হয় তাকে 'থার্মাল প্রিন্টার' বলে। একেবারে গরম গরম ছাপিয়ে দেয়। এটি দামে সস্তা, হালকা, তাই যোগ-বিয়োগের যন্ত্র (অ্যাডিং মেশিন), দোকানের রসিদ (ক্যাশ রেজিস্টার) থেকে ক্রেডিট কার্ড টার্মিনাল— বিভিন্ন জায়গায় ব্যবহৃত হয়।

এই কাগজের ওপরে কয়েক ধরনের রাসায়নিকের প্রলেপ লাগানো থাকে। যেমন, লিউকো ডাই, ডেভেলপার্স, সেনসিটাইজার্স ও স্টেবিলাইজার্স। লিউকো ডাই (Leuco dyes) কথাটা থেকেই বোঝা যায় এটির রঙ সাদা, ঠিকভাবে বলতে গেলে বর্ণহীন। উত্তাপ পেলে বা অ্যাসিডের সংস্পর্শে রঙিন হয়। সাধারণত triaryl methane phthalide-কেই এই লিউকো ডাই হিসাবে ব্যবহার করা হয়। এর অনেক বাণিজ্যিক নাম আছে— ইয়ামামোটো, ব্লু ৪৪৫০, ফ্লুরন ইত্যাদি।

শুধু লিউকো রঙেই কাজ চলে না। কারণ উত্তাপে গলে খুব একটা গাঢ় রঙ ধারণ করে না। লেখা-ছবি কিছুই তেমন স্পষ্ট হয় না। তাই ওর সঙ্গে বিসফেনল জাতীয় কিছু জৈব অ্যাসিড মেশাতে হয়। এই 'একতাই বল'-কে বলে ডেভেলপার্স।

লিউকো ডাই আর ডেভেলপার্স মিলেমিশে ভালই রঙ ফুটিয়ে তোলে। কিন্তু তাতেও গেরো আছে। ওরা সব সময় ভালভাবে মেশে না। তাপ কম হলেও কাজ করতে চায় না। এই সমস্যার হাল করতে হাজির হয় সেনসিটাইজার্স। এটা রঙকে ভালভাবে মিশিয়ে আরও বেশি তাপ-সংবেদী করে তোলে।

কাগজ তো ছাপা হয়ে বেরোল। কিন্তু তার আয়ু যে বড্ড কম। বিশেষ করে গরম এবং আর্দ্র পরিবেশে এই রঙ দ্রুত তাদের নিজস্ব রঙে, মানে বর্ণহীন, ক্রিস্টাল চেহারায় ফিরে যেতে চায়। এটা হলে তো উদ্দেশ্যই মাঠে মারা যায়। তাই ফিকে হয়ে যাওয়ার ব্যাপারটাকে ঠেকিয়ে রাখতেই আসরে নামানো হয় স্টেবিলাইজার্সকে। শব্দটার অর্থই বলে দিচ্ছে এটা স্থিরতা আনে। এক ধরনের জটিল ফেনলকে এই কাজে ব্যবহার করা হয়।

এ তো গেল রাসায়নিক কচকচি। এবার একটু ইতিহাসের দিকে মুখ ফেরানো যাক। এনআরসি কর্পোরেশন এবং থ্রিএম নামে দুটি সংস্থা প্রথম থার্মাল পেপার তৈরি করে। এনআরসি রাসায়নিক রঙ ব্যবহার করতে থাকে। আর থ্রিএম ব্যবহার করতে থাকে ধাতব লবণ। এনআরসি প্রযুক্তিই আসর মাত করে দিতে থাকে। যদিও থ্রিএমের কাগজের দাম ছিল বেশি। সেই সঙ্গে ওদের ছাপা জিনিসের আয়ু ছিল এনআরসি-র তুলনায় বেশি। টেক্সাস ইনস্ট্রুমেন্ট ১৯৬৫ সালে থার্মাল প্রিন্ট হেড আবিষ্কার করে। তার চার বছর পরে আসে 'সায়লেন্ট ৭০০'। এরাই প্রথম থার্মাল পেপারের ওপর ছাপা যায় এমন থার্মাল প্রিন্ট পদ্ধতি নিয়ে আসে। সেই সঙ্গে সেই শুরু হল কম্পিউটারের সঙ্গে থার্মাল প্রিন্টারকে জুড়ে দেওয়ার কাজ। ১৯৭০-এর দশকে ময়দানে নামে হিউলেট প্যাকার্ড। তারা থার্মাল পেপার প্রিন্টারকে কম্পিউটার এবং নানা যন্ত্রের সঙ্গে জুড়ে কার্যকর করে তুলতে থাকে।

কতদিনে থার্মাল পেপারের লেখা একেবারে মুছে যাবে, তা কাগজের গুণমানের ওপর নির্ভর করে। অনেক সময় পাঁচ-ছ বছরও ঠিকঠাক থাকে। এর বিলীন হওয়া ঠেকানোর টোটকা আছে। তার প্রথমটি হল এই কাগজ কখনই প্লাস্টিকে মুড়ে রাখা চলবে না। দ্বিতীয়ত এটিকে আলো এবং তাপ থেকে দূরে রাখতে হবে।

স্বাস্থ্য হ্যাপা

নতুন প্রযুক্তি যেমন নতুন চমক আনে, আনে নতুন সমস্যাও। থার্মাল পেপারও তার বাইরে নয়। এই কাগজে 'বিসফেনল এ' (বিপিএ) ব্যবহার করা হয়। এটি হরমোনতন্ত্রের কাজে বাগড়া দেয় (এন্ডোক্রিন ডিজরাপ্টার)। কাগজ থেকে ত্বকের মাধ্যমে শরীরে ঢুকে পড়তে পারে। বিজ্ঞানীরা বলছেন, পাঁচ সেকেন্ড হাতে ধরে রাখলে এক মাইক্রোগ্রামের কাছাকাছি বিপিএ শরীরে ঢুকে পড়তে পারে। আঙুল ভিজে থাকলে যার পরিমাণ প্রায় দশগুণ বেশি হয়। যাঁরা এই ধরনের প্রিন্টার ও কাগজ নিয়ে কাজ করেন, তাঁদের শরীরে দিনে প্রায় ৭১ মাইক্রোগ্রাম বিপিএ ঢুকে পড়ে। যা স্বাভাবিক মাত্রার চেয়ে অনেক বেশি। নিউ ইয়র্ক সাফোক কাউন্টি তো থার্মাল পেপারে বিপিএ-র ব্যবহার নিষিদ্ধ করে দিয়েছে ৩ জানুয়ারি ২০১৪ থেকে। আইন ভাঙলে ৫০০ মার্কিন ডলার জরিমানা।

উমা

পুস্তক পরিচিতি

সমাজের বিপ্রতীপে একক নারী হৈমবতী

সাদা থান থেকে সাদা অ্যাপ্রন: ডাঃ হৈমবতী সেন–এর জীবন ও সময় (১৮৬৬ – ১৯৩৩) • মূল্য ১৭৫ টাকা • পরিবেশক আশাদীপ, রমানাথ মজুমদার স্ট্রিট, কলকাতা– ৯

কাল: ঊনবিংশ শতাব্দীর দ্বিতীয়ার্ধে ১৮৬৬ সন। স্থান: অবিভক্ত বাংলার খুলনা জিলা। বিবাহ ১০ বছর বয়সে, বছর অতিক্রান্ত হতে না হতে বিধবা। সে যুগের লক্ষ লক্ষ বাঙালি বালবিধবার মতো গঞ্জনা, অবহেলা আর কৃচ্ছ্রসাধনের নীরব জীবন হতে পারতো হৈমবতীর। হয়নি, কারণ তাঁর অদম্য জ্ঞানপিপাসা। এ তাঁরই জীবনবৃত্তান্ত।

সামাজিক রাক্ষণশীলতা আর কুসংস্কার ছিল তাঁর প্রথম বাধা। সে যুগে বিশ্বাস ছিল, লেখাপড়া শিখলে মেয়েরা বিধবা হয়। হৈমবতী তাই পাঠশালায় ভর্তি হতে পারেননি, গুরুমশাইয়ের ফাই–ফরমাস খাটার অছিলায় দরজার বাইরে বসে ছেলেরা যা পড়ত, তাই শুনে শুনে তাঁর বিদ্যারম্ভ। ধরা পড়ে যাওয়ায় ১০ বছর বয়সে তড়িঘড়ি বিয়ে দেওয়া হয় ৪৫ বছর বয়সের এক লম্পটের সঙ্গে, তার দ্বিতীয় স্ত্রী হিসেবে। স্বামীর মৃত্যুর পর হৈমবতীকে তাঁর প্রাপ্য সম্পত্তির অংশ থেকে বঞ্চিত করা হয়। বছর দুয়েকের মধ্যে মা–বাবাও গত হলে একইভাবে যে সম্পত্তির অংশ তাঁর প্রাপ্য ছিল, তা থেকেও তাঁকে বঞ্চিত করা হয়।

নিঃসম্বল অবস্থায় পড়ে তাঁকে হতে হয়েছিল কাশীবাসী, বাঙালি বিধবাদের চিরাচরিত নির্বাসনস্থল! এই দুঃসহ অবস্থার মধ্যেও তিনি তাঁর ভেতরের আগুন নিভতে দেন নি। শিক্ষার আশায় ঝাঁপিয়ে পড়লেন 'অজানিতের পথে', নিশ্চয়তা থেকে অনিশ্চয়তা, এক আবাস থেকে অন্য আবাস, এক গ্রাম থেকে অন্য গ্রাম, নৌকায়, স্টিমারে, ট্রেনে, গরুর গাড়িতেও। এরই মধ্যে হৈমবতীর সংবেদনশীল মন কিছু দুঃস্থকে পক্ষপুটে নিয়ে নিয়েছেন। তিনি রেঁধে, সেলাই করে, স্কুলে শিক্ষকতা করে নিজের ও পোষ্যদের অন্নসংস্থান করে গেলেন। এই কঠিন জীবনসংগ্রাম সত্ত্বেও তাঁর জ্ঞানপিপাসা ক্ষুণ্ন হতে দেননি, পাঠ চালিয়ে গেছেন।

এই ভবঘুরে জীবনের মধ্যেই তিনি একসময়ে ব্রাহ্ম সংস্পর্শে এলেন। তাদের অধিকাংশের সংস্কারমুক্ত মানসিকতা তাঁকে আকৃষ্ট করল, তিনি সে সমাজে যোগ দিলেন। পাঠ চালিয়ে যাওয়ার জন্য জীবনে কিছু স্থিতি আনা প্রয়োজন ছিল। সেই বাসনায় দ্বিতীয়বার বিবাহ করলেন, তখন তাঁর বয়স ২৪ বছর। স্বামী ছিলেন সংসার বিরাগী ধর্মপ্রচারক। তবু অবশেষে হৈমবতী একটি গার্হস্থ জীবন পেলেন, মাও হতে পারলেন।

হৈমবতী শেষ পর্যন্ত ডাক্তার হলেন। শুরু হল কর্মজীবন। আর সেই সঙ্গে শুরু হল আরেকপ্রস্থ লড়াই— লিঙ্গবৈষম্য, ঔপনিবেশিক যুগের বর্ণবৈষম্য আর আমলাতান্ত্রিক কঠোরতার সঙ্গে। অপমানজনক বেতন–বৈষম্য তো ছিলই। শেষ জীবনে তাঁর দৃষ্টিশক্তি ক্ষীণ হয়ে আসছিল। তবু তিনি জীবনের শেষ দিন পর্যন্ত ডাক্তারি চালিয়ে যান। এই পর্যায়েই তিনি আত্মকাহিনী লিখতে শুরু করেন, সাধারণ কয়েকটি খাতায়। নিজের জীবনকাহিনীর সঙ্গে সঙ্গে এই আত্মকথায় ঔপনিবেশিক যুগের বাংলার একটি ছবি ফুটে উঠেছে; কৃষকদের দুর্বিষহ জীবন, জমিদারি শোষণ; বাঙালির সঙ্কীর্ণতা; সংস্কার আন্দোলন, সমাজে মহিলাদের অবস্থান; আর শিশুদের জীবন।

এই আশ্চর্য কাহিনীর উদ্ঘাটনও আশ্চর্য! উৎস আঞ্চলিক ভাষায় লেখা মাটির গন্ধমাখা ঘর গেরস্থালির বাংলায়

সাধারণ কয়েকটি খাতায় একটি আত্মকথা। লেখিকার প্রয়াণের অর্ধশতাব্দী বাদে তাঁর এক দৌহিত্রী খাতাগুলি তুলে দেন বিশিষ্ট ইতিহাসবিদ জেরাল্ডিন ফোর্বস-এর হাতে যিনি মানবীবিদ্যা, বিশেষ করে বাংলার নারীদের নিয়ে চর্চায় আগ্রহী ছিলেন। এর গুরুত্ব উপলব্ধি করে আরেক বিশিষ্ট ঐতিহাসিক তপন রায়চৌধুরী লেখাটির ইংরেজি অনুবাদ করে দেন। সেই স্মৃতিকথা অধ্যাপিকা ফোবর্সের ভূমিকা ও প্রাসঙ্গিক তথ্য নিয়ে প্রথম প্রকাশিত হয় ২০০০ সালে। 'দ্য মেমোয়ার্স অভ ডঃ হৈমবতী সেন: ফ্রম চাইল্ড উইডো টু লেডি ডক্টর' নামে। এ আত্মকথা অধ্যাপিকা ফোবর্সের কাছে এতই গুরত্বপূর্ণ মনে হয়েছিল যে, ১১ বছর পরে ২০১১ সালে আরও বিস্তৃত ভূমিকা ও অতিরিক্ত তথ্যাদি সন্নিবেশিত করে তিনি 'বিকজ আই অ্যাম আ উওম্যান: এ চাইল্ড উইডোস মেমোয়ার্স ফ্রম কলোনিয়াল ইন্ডিয়া' নামে অনুবাদটি পুনঃপ্রকাশ করেন। (প্রসঙ্গত উল্লেখ্য, অধ্যাপিকা ফোর্বস কিছুদিন আগে, ১৩ ফেব্রুয়ারি ২০১৯–এ কলকাতায় ঘুরে গেছেন।)

মূল বাংলা আত্মজীবনী বা ইতিহাসবিদ তপন রায়চৌধুরীর অনুবাদ, কোনোটাই এখন সহজপ্রাপ্য নয়। মূলত ফোবর্সের লেখার ওপর নির্ভর করে আলোচ্য বইটি বাংলাভাষী পাঠকদের জন্য রচনা করেছেন ধ্রুবজ্যোতি দে। হৈমবতীর জীবনযাত্রার গতিপথটি লেখক ধ্রুবজ্যোতি অতি যত্নের সঙ্গে বর্ণনা করেছেন। অপ্রাসঙ্গিক তথ্য বাদ দিয়েছেন যাতে পাঠকের মনোযোগ মূল বিষয় থেকে বিক্ষিপ্ত না হয়। বিকল্পে যোগ করেছেন সেইসব তথ্যাবলী, যা সমসাময়িক প্রেক্ষাপট সম্যক উপলব্ধি করার জন্য প্রয়োজনীয়।

ক্ষীণতনু ১২৭ পৃষ্ঠার ডিমাই সাইজের বইটির প্রকাশনায় যত্নের ছাপ সুস্পষ্ট। অক্ষরের বিন্যাস ও মাপ দৃষ্টিনন্দন ও সহজপাঠ্য। প্রচ্ছদও অর্থবহ। বাংলা বইয়ের পাঠকের কাছে এই প্রয়াস অভিনন্দনযোগ্য। পরিশেষে একটি সতর্কবাণী যোগ করা প্রয়োজন। যাঁরা বিনোদনের জন্য বই পড়েন, এ বই তাঁদের জন্য নয়। বইটি তাঁদের জন্য, যাঁরা জ্ঞানের পরিধি বাড়াতে বই পড়েন। সমাজকে, সময়কে ধরতে চেষ্টা করেন।

অঞ্জনকুমার সেনশর্মা

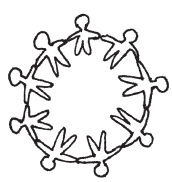

সংগঠন সংবাদ

জাদুমেলা

কয়েক বছর আগেই শুরু হয়েছিল জাদুমেলা। 'ফিমা'র উদ্‌যোগে। রবীন্দ্রসদন চত্বরে আয়োজিত সেই মেলা প্রথম বছর থেকেই নজর কাড়ছিল। এবার সেই মেলা আয়োজন হল উল্টোদিকে মোহরকুঞ্জে। মেলায় একটা মূল মঞ্চ থাকে, সেটি জাদুসম্রাট পি সি সরকারের নামে করা হয়। যেখানে প্রতিদিন নানা অনুষ্ঠান হয়। এছাড়া খোলা মাঠে বসে মাদারির খেলা, জাগলিং, জাদু, আগুন নিয়ে খেলা ইত্যাদি। প্রচুর দোকান দেওয়া হয় সেখানে বিক্রি হয় জাদুর বইপত্র, সরঞ্জাম। নবীন–প্রবীণ জাদুকররা প্রতিদিনই হাজির থাকেন। কেউ খেলা দেখান, কেউ ছোটদের খেলা শিখিয়ে দেন। এবারে প্রথম দিনই প্রিন্স শীল 'বুলেট ক্যাচিং ট্রিক' দেখিয়ে আসর জমিয়ে দিয়েছেন। শেষদিন ছিল চোখ বেঁধে মোটরসাইকেল চালানো। প্রতিদিন উপচে–পড়া ভিড়ই বলে দিল মেলা কেমন জমেছে।

বেপরোয়া বনবিহারী

ডাঃ বনবিহারী মুখোপাধ্যায়কে আমরা প্রায় ভুলেই গিয়েছি। বনফুল তাঁর এই ডাক্তারি ও সাহিত্যের গুরুকে নিয়ে লিখেছিলেন 'অগ্নীশ্বর' উপন্যাস। যা থেকে অরবিন্দ মুখোপাধ্যায় এক অনবদ্য ছবি বানিয়েছিলেন। নামভূমিকায় উত্তমকুমার অসাধারণ অভিনয় করেছিলেন। ধর্ম, কুসংস্কার, সামাজিক বৈষম্যের বিরুদ্ধে বনবিহারী ছিলেন আপসহীন যোদ্ধা। সেই সঙ্গে ছিলেন দরদী, মানবিক চিকিৎসক। যেমন ছিল ব্যঙ্গ রচনার হাত, তেমনই আঁকতেন কার্টুন। কয়েকজনের সঙ্গে 'বেপরোয়া' নামে এক পত্রিকা প্রকাশ করতেন। শুধু নামে নয় কাজেও পত্রিকাটি ছিল বেপরোয়া, জেহাদি। জুলাই–সেপ্টেম্বর ২০১১ থেকে উৎস মানুষ পত্রিকায় ধারাবাহিকভাবে ছ কিস্তিতে প্রকাশিত হয়েছিল ওঁকে নিয়ে লেখা। সেটিই এবার 'বেপরোয়া বনবিহারী' নামে বই হিসাবে প্রকাশ করল বাগবাজারের 'সূত্রধর' প্রকাশন। ৬ এপ্রিল, উত্তর কলকাতার ছাতুবাবু–লাটুবাবুর বাড়িতে। বইতে ওঁর বেশ কিছু লেখা এবং আঁকা ছবিও আছে।